টেনিদা দি গ্রেট

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

নতুন মুদ্রণ : বৈশাখ, ১৩৬৮

প্রকাশক : ময়ূখ বসু গ্রন্থপ্রকাশ : ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ মুদ্রক : প্রশান্ত কুমার মণ্ডল : ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ১বি গোয়াবাগান স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

এই লেখকের

কিশোর সঞ্চয়ন

পটল ডাঙ্গার টেনিদা

চারমূর্তির অভিযান

নিদারুণ প্রতিশোধ

এক

চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে পটলডাঙার টেনিদা বেশ মন দিয়ে তেলেভাজা খাচ্ছিল। আমাকে দেখেই কপ কপ করে বাকী বেগুনী দুটো মুখে পুরে দিয়ে বললে, এই যে শ্রীমান প্যালারাম, কাল বিকেলে কোথায় গিয়েছিলে? খেলার মাঠে তোর যে টিকিটাও দেখতে পেলুম না, বলি ব্যাপারখানা কী?

আমি বললুম, আমি মেজদার সঙ্গে সার্কাস দেখতে গিয়েছিলাম —বটে—বটে! তা কী রকম দেখলি?—খাসা! ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস্ যাকে বলে। হাতী-বাঘ, সিঙ্গি, ফ্লায়িং ট্রাপিজ্, মোটর সাইকেল—কত কী! কিন্তু জানো টেনিদা, সব চাইতে ভালো হল শিম্পাঞ্জীর খেলা। চা খেলো, চরুট ধরালো—আরে ছোঃ ছোঃ!—টেনিদা নাকটাকে কুঁচকে পাতিনেবুর মত করে বললে, রেখে দে তোর শিম্পাঞ্জী। আমার কুট্টিমামার বন্ধু রামগিদ্ধড়বাবু একবার একটা গোদা হনুমানের যে খেল্ দেখেছিলেন, তার কাছে কোথায় লাগে তোর সার্কাসের শিম্পাঞ্জী! নস্যি—স্রেফ্ নস্যি।—তাই নাকি?—আমি টেনিদার কাছে ঘন হয়ে বসলুম: রামগিদ্ধড়বাবু কোথায় দেখলেন সে খেলা?—উড়িষ্যায়।

আমি মাথা নেড়ে বললুম, বুঝেছি। পুরীতে গিয়ে জগন্নাথের মন্দিরে আমি কয়েকটা বড়ো বড়ো হনুমান দেখেছিলুম।

—ধ্যাত্তোর পুরী! ওগুলো আবার মনিষ্যি—থুড়ি হনুমান নাকি? গাদা গাদা জগন্নাথের পেসাদ খেয়ে নাদাপেট নিয়ে বসে আছে—গলায় একটা করে মাদুলি পরিয়ে দিলেই হয়। হনুমান দেখতে গেলে জঙ্গলে যেতে হয়, মানে কেওনঝড়ের জঙ্গলে।

—কেওনঝড়! সে আবার কোথায়?—তাই যদি জানবি, তা হলে পটলডাঙায় বসে পটল দিয়ে সিঙ্গি মাছের ঝোল খাবি কেন

র‍্যা ? নে, গপ্পো শুনবি তো এখন মুখে ইস্ক্রুপ্ এঁটে চুপটি করে বসে থাক্—বকের মত বক্‌বক্ করিস্ নি।

বক তো বক্‌বক্ করে না—ক্যাঁ-ক্যাঁ করে ?—চোপ রাও! বক বক্‌বক্ করে না ? তা হলে তো কোন্‌দিন বলে বসবি, কাক কা-কা করে না, পাঁটার মতো ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে ডাকে ?

—হয়েছে, হয়েছে, তুমি বলে যাও।—বলবই তো, তোকে আমি তোয়াক্কা করি নাকি ? এখন আমাকে ডিস্‌টার্ব করিস নি। মন দিয়ে রামগিদ্ধড়বাবুর গপ্পো শুনে যা—বিস্তর জ্ঞান লাভ করতে পারবি। হয়েছে কি, রামগিদ্ধড়বাবু কন্‌ট্রাক্‌টারের কাজ করতেন। মানে পুল-টুল, রাস্তাঘাট এইসব বানাতে হত তাঁকে। সেই কাজেই তাঁকে সেবার কেওনঝড়ের জঙ্গলে যেতে হয়েছিল।

কুলি, তাঁবু, জীপগাড়ী—এই সব নিয়ে সে এক এলাহী কাণ্ড। বনের ভেতরেই একটুখানি ফাঁকা জায়গা দেখে রামগিদ্ধড় তাঁবু ফেলেছেন। মাইল দুই দূরে পাহাড়ী নদীর ওপর একটা পুল তৈরী হচ্ছে, সকালে বিকালে সেখানে জীপ নিয়ে রামগিদ্ধড় কাজ দেখতে যান।

জঙ্গলে এনতার হনুমান, গাছে গাছে তাদের আস্তানা। কিন্তু লোকজনের উৎপাতে আর জীপের আওয়াজে তারা এদিক ওদিক পালিয়ে গেল। রামচন্দ্রজী তো আর নেই—কার ওপরে আর ভরসা রাখবে বল্ ? কুলিরা অবিশ্যি মাঝে মাঝে ঢোল আর খঞ্জনী বাজিয়ে 'রামা হো রামা হো' বলে গান গাইত, কিন্তু সেই বিকট চীৎকার শুনে কি আর অবোলা জীব কাছে আসতে সাহস পায় ?

তবু একটা কাণ্ড ঘটল।

সেদিন দুপুরবেলা তাঁবুর বাইরে বসে রামগিদ্ধড় চাপাটি খাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, সামনে গাছের ডালে বসে একটা গোদা হনুমান জুল্‌জুল্ করে তাকাচ্ছে। মুখের চেহারা ভারী করুণ—'কাঙালকে কিছু দিয়ে দিন দাতা'—ভাবখানা এই রকম।

রামগিদ্ধড় বাবুর ভারী মায়া হল। একটা চাপাটি ছুড়ে দিলেন, হনুমান সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মাথাটা একবার সামনে ঝুঁকিয়ে দিলে, যেন বললে, 'সেলাম হুজুর।' তার পরেই টুপ করে গাছের ডালে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

পরের দিন রামগিদ্ধড় যেই খেতে বসেছেন, ঠিক হনুমানটা এসে হাজির। আজও রামগিদ্ধড় তাকে একটা চাপটি দিলেন, সে-ও তেমনি করেই তাঁকে সেলাম দিয়ে, চাপাটি নিয়ে উধাও হল।

এমনি চলতে লাগল মাসখানেক ধরে। রোজ খাওয়ার সময় হনুমানটা আসে তার বরাদ্দ চাপাটিখানা নিয়ে চলে যায়, যাওয়ার সময় তেমনি মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম করে। আর কোন রকম বিরক্ত করে না, কোনোদিন একখানার বদলে দুখানা চাপাটি চায় না। মানে সেই বর্ণ-পরিচয়ের সুবোধ বালক। গোপালের মতো আর কি—যাহা পায়, তাহাই খায়।

তা খাচ্ছিল, চলছিলও বেশ, রামগিদ্ধড় বাবুই একদিন গোলমালটা পাকিয়ে বসলেন। সেদিন কুলিদের সঙ্গে বকাবকি করে মেজাজ অত্যন্ত খারাপ—অন্যমনস্কভাবে খেয়েই চলেছেন। ওদিকে সেই গোপাল-মার্কা সুবোধ হনুমান যে কখন থেকে ঠায় বসে আছে, সেদিকে তাঁর খেয়ালই নেই। ধীরে-সুস্থে সব ক'টা চাপাটি চিবুলেন, বড় একবাটি দুধ খেলেন, তারপর মোটাসোটা গোঁফজোড়া মুছতে মুছতে উঠে গেলেন। হনুমানের কথা তাঁর মনেও পড়ল না।

পরদিন যেই চাপাটির থালা নিয়ে বসেছেন—অমনি 'হুপ্' করে এক আওয়াজ। ব্যাপার কী যে হল, ভাল করে ঠাহর করবার আগেই রামগিদ্ধড় দেখলেন, থালার আটখানা চাপাটিই বেমালুম ভ্যানিশ্। তাঁর নাকের সামনে মস্ত একটা ল্যাজ একবার চাবুকের মতো দুলে গেল, 'হুপ্' করে শব্দ আর একবার গাছের ডাল ঝর্ ঝর্ করে নড়ে উঠল—ব্যাস, কোথাও আর কিছু নেই।

দু একজন কুলি হৈ হৈ করে উঠল, ঠাকুর হায়-হায় করতে লাগল

আর রামগিদ্ধড় স্রেফ্ হাঁ করে রইলেন। আঁ—এইসা বেইমানি ! রোজ রোজ হতচ্ছাড়া হনুমানকো চাপাটি খিলাচ্ছি—আর সে কিনা অ্যায়সা বেত্মিজ। আর কোনো জানোয়ার হলে রামগিদ্ধড় তাকে গুলি করে মারতেন, কিন্তু মহাবীরজীর জাতভাইকে তো আর সত্যিই গুলি করা যায়না। সে তো মহাপাপ।

রাগের চোটে রামগিদ্ধড় মুখের এক গোছা গোঁফই টেনে ছিঁড়ে ফেললেন। বললেন, দাঁড়াও—রামগিদ্ধড় চৌধুরী খাস বলিয়া জিলার রাজপুত। আমিও তোমায় ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। পরদিন ঠাকুর-কে ডেকে বললেন, এখানে সব চাইতে ঝাল যে মিরচাই—মানে লঙ্কা পাওয়া যায়, তারই বাটনা কর্ ছটাকখানেক। আর তাই দিয়ে তৈরী কর্ তুখানা চাপাটি। তারপর আমি দেখে নিচ্ছি হনুমানজীকে—

খেতে বসেই কোনদিকে না তাকিয়ে—মানে থালাশুদ্ধ্ লোপাট হওয়ার কোনো চান্স্ না দিয়েই রামগিদ্ধড় সেই লঙ্কাবাটা ভর্তি চাপাটি তুখানা ছুড়ে দিলেন মাটিতে। আবার শব্দ হল 'হুপ্'—হনুমান নেমে পড়ল, কুড়িয়ে নিলে চাপাটি, রোজগার মতো সেলাম করলে, তারপরেই টুপ্ করে গাছের ডালে। রামগিদ্ধড়ের কুলিরা তাঁর তুপাশে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে রইল—যাতে কোনো অঘটন না ঘটে। আর তু মিনিটের ভেতরেই গাছের ওপর থেকে নিদারুণ এক চিৎকার শোনা গেল। হনুমান এ ডাল থেকে ও ডালে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল, আওয়াজ হতে লাগল : খ্যাঁ—খ্যাঁ—খ্যাঁ খোঁ—খোঁ উপুস্—গুপুস্ ! পাখিরা চিৎকার করে পালাতে লাগল, গাছের ছেঁড়া পাতা উড়তে লাগল চারদিকে। মানে, দ্বিতীয়বার হনুমানের মুখ পুড়ল আর শুরু হয়ে গেল দস্তুরমতো লঙ্কাকাণ্ড !

গাছ থেকে হনুমান চেঁচাতে লাগল : খ্যাঁ-খ্যাঁ-খ্যোঁঃ-খ্যোঁঃ, আর নীচ থেকে সদলবলে রামগিদ্ধড় হাসতে লাগলেন : হ্যাঃ—হ্যাঃ—হোঃ—হোঃ ! হনুমান আজ আচ্ছা জব্দ হয়েছে। রামগিদ্ধড়ের চাপাটি লুট ! মানুষ চেনোনা ! বোঝো এখন।

খানিকক্ষণ দাপাদাপি করে হনুমান কোন্‌দিকে ছটকে পড়ল কে জানে। আর রামগিদ্ধড় আরো আধঘণ্টা ভুঁড়িকাঁপানো অট্টহাসি হেসে তাঁর সেই জীপ গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কাজ দেখতে। হনুমানের মুখ পুড়িয়ে মনে মনে তো বেজায় খুশি হয়েছেন, কিন্তু রামায়ণে রাবনের যে কী দশা হয়েছিল, সেটা বেমালুম ভুলে গেছেন তখন, টের পেলেন বিকেলেই।

কাজ দেখে যখন ফিরে আসছেন, বনের মধ্যে তখন ছায়া নেমেছে। দিব্যি ঝিরেঝিরে হাওয়া বইছে, চারদিকে পাখিটাখি ডাকছে, রামগিদ্ধড়ের মেজাজটাও ভারি খুশি হয়ে রয়েছে। আস্তে আস্তে জীপ চলছে আর রামগিদ্ধড় গুণগুণ করে গান গাইছেন: আরে হাঁ—বন্‌মে চলে রামচন্দজী, সাথমে চলে লছ্‌মন ভাই—এই সময় জীপের ড্রাইভার বাঁটকুল সিং বললে, আর এ কোন্‌ বেকুবের কাণ্ড। রাস্তাজুড়ে গাছের ডাল ভেঙে রেখেছে! এখন যাই কী করে? রামগিদ্ধড় দেখলেন তাই বটে। ছোট বড়ো ডালপালা দিয়ে বনের ছোট পথটি যেন একেবারে ব্যারিকেড্‌ করে রাখা হয়েছে। বুনো লোকগুলোর কারবারই আলাদা। বিরক্ত হয়ে বললেন, গাড়ী থামিয়ে রাস্তা সাফা করো বাঁটকুল সিং! বাঁটকুল সিং জীপ থেকে নেমে রাস্তা পরিষ্কার করতে যাচ্ছে, আর ঠিক তখন—গুপ—গাপ, হুপ—হুপ—গবাৎ—

সমস্ত বন যেন একসঙ্গে ডাক ছেড়ে উঠল। গাছের মাথায় মাথায় ঝড় বয়ে গেল, আর বললে বিশ্বাস করবিনে প্যালা, হুপদাপ শব্দে কোত্থেকে কম্‌সে কম দেড়শো হনুমান লাফিয়ে পড়ে রামগিদ্ধড় বাবুর জীপ গাড়ী ঘেরাও করে ফেললে। দ্বিতীয় লঙ্কাকাণ্ডের পর এ যেন দ্বিতীয় রাবণ বধের ব্যবস্থা।

ব্যাপার দেখেই তো বাঁটকুল সিংয়ের হয়ে গেছে! সে তো 'আরে বাপ' বলে বনবাদাড় ভেঙে টেনে দৌড়! রামগিদ্ধড়ও জীপ থেকে লাফিয়ে পড়লেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দশ বারোটা গোদা হনুমান তাঁকে জাপটে ধরলে।

—বাবারে মা-রে—গেছিরে—বলে পরিত্রাহি হাঁক ছাড়লেন রামগিদ্ধড়, কিন্তু দেড়শো হনুমানের গুপগাপ শব্দে তাঁর চ্যাচানি কোথায় তলিয়ে গেল। তখন কী হল বল্ দিকি? দুটো হনুমান তাঁর দু'কান শক্ত করে পাকড়ে ধরলে, একটা তাঁর দু গালে ঠাঁই ঠাঁই করে বেশ ক'বার চড়িয়ে দিলে।

—জান গিয়া জান গিয়া—বলে যেই রামগিদ্ধড় চেঁচিয়ে উঠে হাঁক ছেড়েছেন সঙ্গে সঙ্গে সেই যে হনুমান—সকালে যাকে খুব জব্দ করেছিলেন, সে রামগিদ্ধড়ের মুখের ভেতর একখানা চাপাটি গলা পর্যন্ত ঠেসে দিলে।

কোন্ চাপাটি বুঝেছিস তো? মানে, লঙ্কা বাটায় লাল টুকটুকে সেই দোসরা নম্বরের চীজটি। জিভে সেটা লাগতে না লাগতেই রামগিদ্ধড়ের মুখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। একবার ফেলে দিতে গেলেন মুখ থেকে—কিন্তু সাধ্য কী! তক্ষুনি দু গালে ধাম্ ধাম্ করে দুই থাপ্পড়।

অগত্যা রামগিদ্ধড় নিজের কীর্তি সেই চাপাটি খেলেন, মানে খেতেই হল তাঁকে। দেড়শো হনুমানের সঙ্গে তো আর চালাকি নয়। দেড়শো হাতের দেড়শো চাঁটি খেলে রামগিদ্ধড়ও রাম ইঁদুর হয়ে যাবেন। কিন্তু চাঁটি বাঁচাতে যা খেলেন তা চাপাটি নয়—সোজাসুজি দাবানল—যাকে বলে! চিবুনি দিতেই চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল, মনে হতে লাগল গলা থেকে চাঁদি পর্যন্ত কী বলে—একেবারে লেলিহান শিখায় জ্বলছে! রামগিদ্ধড় কেবল তারস্বরে বলতে পারলেন : জল—তার পরেই সব অন্ধকার!

ওদিকে কুলির দল আর বন্দুক-টন্দুক নিয়ে বাঁটকুল যখন ফিরে এল, তখন হনুমানদের এতটুকু চিহ্ন কোথাও নেই। কেবল রামগিদ্ধড় পথের মাঝখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তারপর সেই চাপাটির চোট্ সামলাতে পাক্কা একটি মাস হাসপাতালে।

তাই বলছিলুম, আমার কাছে সার্কাসের শিম্পাঞ্জীর গল্পো আর

করিসনি। আসল খেল্ দেখতে চাস তো সোজা কেওনঝড়ের জঙ্গলে চলে যা!

এই বলে পটলডাঙ্গার টেনিদা আমার চাঁদিতে কড়াং করে একটা গাট্টা মারল আর তার পরেই তিন চারটে বড়ো বড়ো লাফ দিয়ে সোজা শ্রদ্ধানন্দ পার্কের দিকে হাওয়া হয়ে গেল।

ব্রহ্মবিকাশের দন্তবিকাশ

দুই

হাবলু আর ক্যাবলা কলকাতায় নেই। গরমের ছুটিতে একজন গেছে বহরমপুরে পিসীমার বাড়ীতে আম খেতে, আর একজন মা-বাবার সঙ্গে উধাও হয়েছে শিলঙে। এখন পটলডাঙ্গা আলো করে আছি আমরা দুই মূর্তি—আমি আর টেনিদা। টেনিদাকেও দিনতিনেক দেখা যাচ্ছে না—কোন্ তালে যে ঘুরছে কে জানে।

ভাবছি বল্টুদার কাছেই যাই, বেশ সময় কাটবে। বল্টুদা আবার টেনিদার নাম শুনতে পারে না—বলে, টেনিদা আবার মানুষ নাকি? এক নম্বরের চালিয়াৎ, কেবল উষ্টুম-ধুষ্টুম গল্পো বানাতে পারে—আর সকলের সঙ্গে মারামারি করতে পারে—ছোঃ ছোঃ! আর টেনিদা বলে, বল্টো? ওটা একটা গোভূত। ফুটবল মাঠে একবার পেলে এমন একখানা ল্যাং মেরে দেব না যে, একমাস চিৎপটাং হয়ে থাকবে।

বল্টুদার কাছেই বেরুচ্ছি, হঠাৎ টেনিদার সঙ্গে দেখা।

'কিরে, মুখখানা যে ভারী খুশি-খুশি দেখছি—একেবারে ছানার পোলাওয়ের মতো! বলি, যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

প্রায় বলেই ফেলেছিলুম বল্টুদার বাড়ি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলুম। তা হলেই আর দেখতে হত না—ফটাং করে একটা রামগাঁট্টা

পড়ত মাথার ওপর। বললুম, 'এই ইয়ে মানে—একটু হাওয়া খেতে যাচ্ছিলুম।'

'দুদ্দুর—হাওয়া আবার খায় কে? হাওয়া খাওয়ার কোনো মানে হয় নাকি? হাওয়া খেয়ে পেট ভরে? চপ, কাটলেট, পুডিং—এইসব খাবি?'

শুনে, আমার রোমাঞ্চ হল।

বললুম, 'কেন খাব না, আলবাৎ খাব। পেলেই খেতে থাকব! কে খাওয়াবে—তুমি?'

টেনিদা আমার পিঠে ধাঁই করে চড় মারল একটা।

'বদনাম দিসনি প্যালা—বলে দিচ্ছি সে কথা!'

'বদনাম মানে?'

'আমি—এই টেনিরাম শর্মা—কাউকে কক্ষণো খাওয়াই না—নিজেই খেয়ে থাকি বারবার। এ হচ্ছে আমার নীতি—মানে প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌। তোকে খাওয়াতে গিয়ে প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌ নষ্ট করব? তুই তো দেখছি একটা নিরেট কুরুবক।'

আমার বুকভরা আশা ধুক্‌ করে নিবে গেল। শুকনো মুখে বললুম, 'তবে কে খাওয়াবে? কার গরজ পড়েছে আমাকে চপ কাটলেট পুডিং খাওয়াবার?

'আছে—আছে—লোক আছে। সব খাবার সাজিয়ে বসে আছে। কেবল খেতে পারলে হয়!'

'অ—দোকানে।'—আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, 'খাওয়া-দাওয়ার কথা নিয়ে ঠাট্টা কোরো না টেনিদা, এ-সব খুব সিরিয়াস ব্যাপার। মনে ভীষণ ব্যথা লাগে।'

'তোর মগজে কিচ্ছু নেই, স্রেফ ঝিঙে-চচ্চড়িতে ভরতি। দোকান টোকান নয়—একদম ফ্রী। তুই গেলেই টেবিল সাজিয়ে খেতে দেবে। কিন্তু খেতে পারবি না।'

মানে শুনে কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল: টেবিল সাজিয়ে

খেতে দেবে, অথচ খেতে পারব না? পচা-টচা বুঝি? নাকি কেষ্টনগরের মাটির তৈরী?'

'উহুঁ, আসল—ওরিজিন্যাল। একদম ফ্রেশ। খেতে দেবে, অথচ খেতে পারবি না। উলটে, চোখ কপালে তুলে মরতে মরতে ফিরে আসবি।'

এ যে দেখছি রহস্যের খাসমহল তৈরী করছে। চপ-কাটলেট-পুডিং নিয়ে এসব ধাষ্টামো আমার ভালো লাগে না। আমি রেগে বললুম, 'সব বানিয়ে বানিয়ে যা তা বলছো। আমি চললুম।'

'আহা-হা—চটে যাচ্ছিস কেন?'—টেনিদা বললে, আমি তো তোকে নেমন্তন্ন করতে আসছিলুম। সেই সঙ্গে বলতে আসছিলুম, খেতে দেবে অথচ খেতে পারবি নে, মাঝখান থেকে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

'খেতে দিয়ে বুঝি লাঠিপেটা করে?'

'দ্যুৎ! খুব মিষ্টি মিষ্টি হেসে হাসির গল্পো করে। আর সেই গল্পোই মারাত্মক।'

'কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

মিটমিট করে হেসে টেনিদা বললে, 'তা হলে সবটা খুলে বলি তোকে। আয়—বসা যাক একটু।'

দুজনে মিলে বসে পড়লুম চাটুজ্জেদের রোয়াকে। টেনিদা বললে, 'ব্রহ্মবিকাশবাবুকে জানিস?'

বললুম, 'না। অমন বিটকেল নামের কাউকে আমি চিনি না। চিনতে চাই না।'

'তিনিই খাওয়াতে চান।'

'খাওয়াতে চান তো খেতে দেন না কেন? তার মানে কি?'

'মানে—ওইটেই ওঁর রসিকতা।'

'অ্যাঁ।'

'বলছি-বলছি, বেশ মন দিয়ে শুনে যা। বুঝলি, ব্রহ্মবিকাশবাবুকে

আমিও চিনতুম না। একদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সামনে নিজেই যেচে আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। বললেন, তুমিই বুঝি পটলডাঙ্গার টেনিরাম? বেশ—বেশ! বড়ো আনন্দ হল। অনেক নাম শুনেছি তোমার—তোমার বন্ধু প্যালারামের লেখা দু'একটা গল্পোও পড়ে ফেলেছি। তা এসো না আজ বিকেলে অখিল মিস্তিরি লেনে আমার বাড়িতে। একসঙ্গে চা-টা খাওয়া যাবে।

বুঝলি, সে হল গত বছর পুজোর সময়, তোরা কেউ কলকাতায় নেই তখন। থাকলে তো দলবলসুদ্ধুই নিয়ে যেতুম। কিন্তু গিয়ে বুঝলুম—তোদের নিয়ে গেলে একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যেত।

অখিল মিস্তিরি লেনে বেশ বড়ো বাড়ি—পাট না ঝোলা গুড় কিসের যেন ব্যবসা করে অনেক টাকা জমিয়েছেন ব্রহ্মবিকাশবাবু। বিয়ে-থা করেননি; একা থাকেন, খুব ছিমছাম, দারুন পরিপাটি। বাড়িতে থাকার মধ্যে একজন আধবুড়ো চাকর।

দরজার বেল টিপতেই সে এসে খুব খাতির করে নিয়ে গেল। একেবারে ডাইনিং হলে। সে একেবারে এলাহীকাণ্ড—বুঝলি! পট ভরতি চপ-কাটলেট-সিঙ্গাড়া, প্লেটে বোমার তালের মতো ইয়া এক পুডিং। কা সব দামী দামী কাপ-প্লেটে, সে আর কী বলব তোকে। একটা চেয়ারে জাঁকিয়েই বসেছিলেন ব্রহ্মবিকাশবাবু, আমাকে দেখেই চিনিমাখা হাসি হেসে বললেন, এসো হে, তোমার জন্যই বসে আছি।

খাবারের আয়োজন দেখেই তো আমার এক বচ্ছরের খিদে এক-সঙ্গে পেয়ে গেল। বললুম, হেঁ-হেঁ, কী সৌভাগ্য। বলেই, প্লেটে গোটা দুই কাটলেট একসঙ্গে তুলে নিলুম।

ব্রহ্মবিকাশ আড়চোখে একবার চেয়ে দেখলেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন, এসো হে টেনিরাম, একটু মজা করে খাওয়া যাক। শুনেছি তুমি খুব খেতে পারো; আমিও খাইয়ে লোক। কম্পিটিশ্যন হোক—দেখা যাক কে কত তাড়াতাড়ি খেতে পারে।

জানিস তো, এ রকম কম্পিটিশুনে আমি সর্বদাই রেডি। নিজের খাবার চক্ষের নিমেষে ফিনিশ করে কিভাবে তোদের প্লেটগুলো টেনে নিই—সে তো হাড়ে হাড়ে টের পাস তোরা। বললুম, হেঁ-হেঁ সে তো খুব আনন্দের কথা। মনে মনে ভাবলুম, দাঁড়ান মশাই, আজ ব্রহ্ম খাওয়া দেখিয়ে দেব আপনাকে!

'কিন্তু—'

টেনিদা থামল। আমি আকুল হয়ে বললুম 'কিন্তু কি?'

'দাঁড়া না ঘোড়াড্ডিম।'—

মুখটাকে আলুভাজার মতো করে টেনিদা বললে, 'মনের দুঃখটা একটু সামলে নিতে দে। বুঝলি, কিচ্ছু খেতে পারলুম না—একখানা মোক্ষম বিষম খাওয়া ছাড়া। আর আমি যখন কপালে চোখ তুলে ত্রিভুবন দেখছি; তখন সব খাবারগুলো ব্রহ্মবিকাশবাবু পরিপাটি করে খেয়ে ফেললেন।'

'কি রকম?'

আরে সেইটেই তো প্যাঁচ। এক কামড়ে যেই আধখানা কাটলেট মুখে পুরেছি, ব্রহ্মবিকাশ বললেন, ওহে টেনিরাম, একটা মজার ব্যাপার শোনো। এক ভদ্দরলোক না—পকেটে একটা মস্ত ছুঁচো নিয়ে বাসে উঠেছেন। যেই পকেটমার সে পকেটে হাত ঢুকিয়েছে, অমনি ছুঁচোটা ই-ক্রিঁচ বলে দিয়েছে তার আঙুলে কামড়ে—

বুঝলি, সেরেফ একটা বাজে মিথ্যে কথা। কেউ কি ছুঁচো পকেটে নিয়ে বাসে ওঠে? ছুঁচো কি মানিব্যাগ কিংবা রুমাল, কিংবা চাবির রিং? কিন্তু এমন বিটকেল ভঙ্গীতে কথাটা বললেন যে শুনে আমার বেদম হাসি পেয়ে গেল। সেই হাসির চোটে আধখানা কাটলেট গলায় গিয়ে আটকালো—দম আটকে যায় আর কি। চাকরটা বোধহয় জল হাতে রেডিই ছিল; মাথায় থাবড়ে-থাবড়ে জল দিতে যখন আমি খানিকটা সুস্থ হলুম—তখন বুঝলি, প্রায় সব ফিনিশ

—কেবল আমার পাতের সেই আধখানা কাটলেট পড়ে আছে। গোটাটা উনিই তুলে নিয়ে মেরে দিয়েছেন।

চুকচুক করে বললেন, আহা-হা টেনিরাম, বিষম খেয়ে কম্পিটিশ্যনে হেরে গেলে? খাবার তো আর নেই—একটু চা খাবে নাকি?

হুঁ—চা খেতে গিয়ে আবার একখানা বিষম খাই আর কি? আমি ঘোঁত ঘোঁত করে বেরিয়ে এলুম।

টেনিদার কথা শুনে আমি বললুম, 'ওটা অ্যাকসিডেণ্ট। হঠাৎ বিষম খেয়েই তুমি খেতে পেলে না।'

'মোটেই না। ওই হচ্ছে ওঁর কায়দা। রাস্তায় বেরিয়ে চার পাঁচটা ছেলের সঙ্গে দেখা। দুজন আমাকে চেনে। একজন ওই বিশু—সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ব্যাকে খেলে। বিশু বললে, ব্যাপার কী টেনিদা? ব্রহ্মবিকাশ চোংদারের বাড়ি বুঝি খেতে গিয়েছিলে? প্রাণ নিয়ে ফিরেছো তো?

আমি তো থ।

তাদের কাছেই শুনলুম। এ হল ব্রহ্মবিকাশবাবুর খুব মজার খেলা। লোককে খেতে বলেন, তারা খাওয়া শুরু করলেই বিচ্ছিরি ভঙ্গিতে একটা উদ্ভট কথা বলে দেন। সে তক্ষুণি বিষম খায়; প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে আর সেই ফাঁকে ব্রহ্মবিকাশ সব সাফ করে দেন। এই সেই কথামালার শেয়াল আর সারসের গল্পের মত—বুঝেছিস্?'

আমি শুনে বললুম, 'কেউ যদি না হাসে, রামগরুড় হয়?'

রামগরুড়কেও হাসিয়ে দেবেন; এমনি ওঁর বলার কায়দা। তুই আমি কিরে-একবার এক জাঁদরেল কাবলীওয়ালাকে পর্যন্ত—

'কাবলীওলা! তাকে পেলেন কোথায়?'

'কী করবেন। কেউ তো আর আসে না—সবাই চিনে ফেলেছে কিনা! শেষে রাস্তা থেকে এক কাবলীওয়ালাকে অনেক ভুজুং ভাজুং দিয়ে ডেকে আনলেন। তারপর খেতে দিয়েই শুরু করলেন, সমঝা হ্যায় আগা সাহেব, এক আদমিকো বহুৎ লম্বে দাড়ী থা। ওহি

দাড়ীমে এক জিন তো ঘুস্ গিয়া। যব উয়ো আদ্‌মি কুচ্ খানেকে লিয়ে মুখে হাত লে যাতা, তব্ ওহি জিন সেইসব লাড্ডু-মণ্ডা ঝাঁ করে কেড়ে লেতা, আর দাড়ীমে ছিপায়কে আপনি খা লেতা।—

মানে, বুঝলি না, একটা লোকের লম্বা দাড়ির ভেতরে জিন—মানে একটা দৈত্য ঢুকে গিয়েছিল। লোকটা লাড্ডু-মণ্ডা কিছু খাবার জন্যে মুখে তুললেই ঝাঁ করে কেড়ে নিয়ে দাড়িতে লুকোনো দৈত্যটা সেগুলো খেয়ে ফেলত। যেই বলা—কাবলীওয়ালা অ্যায়সা বিষম খেলো যে তিন দিন হাসপাতালে। তারপর সেই যে দেশে চলে গেল, আর তার পাত্তা নেই।

আমি বললুম, 'কী ডেন্‌জারাস।'

'শুধু ডেন্‌জারাস? যাকে বলে পুঁদিচ্চেরি। কিন্তু এখন হয়েছে কি, আজ সকালে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। বললেন, টেনিরাম, অনেকদিন তো তোমার সঙ্গে চা খাওয়া হয়নি, এসো না আজ বিকেলে। বেশ মজার গপ্পো-টপ্পো করা যাবে। আমি বললুম, আমার বন্ধু প্যালাকেও সঙ্গে আনব নাকি? উনি বললেন, সে তো খুব ভালো কথা—নিশ্চয় নিয়ে আসবে। কিরে যাবি?'

আঁতকে বললুম, 'উঁহু, নেভার। আমি চপ কাটলেট খেতে চাই, বিষম খেতে চাই না।'

খুব গম্ভীর হয়ে টেনিদা একটু ভাবল। তারপর বললে, 'লুক হিয়ার প্যালা।'

'ইয়েস স্যার।'

'ইয়ার্কি দিস নি—ব্যাপারটা খুব পুঁদিচ্চেরি—একেবারে মেফিস্টোফিলিস যাকে বলে। আমি একটা প্ল্যান ঠাউরেছি।'

'কোনো প্ল্যানের ভেতরে আমি নেই। আমার আবার একটুতেই দারুণ হাসি পায়। মারা যাব নাকি শেষ পর্যন্ত?'

'দাঁড়া না কাঁচকলা। শোন্। যেই উনি বেয়াড়া একটা হাসির গল্পো আরম্ভ করবেন না—তুই কটাস করে আমাকে একটা চিমটি

লাগাবি; আমিও একটা লাগিয়ে দেব তোকে। ব্যাস—আর হাসাতেই পারবেন না। তারপর—ডি-লা—গ্র্যাণ্ডি—হুঁ, মাথায় একটা মতলব এসেছে। দিচ্ছি আজকে ব্রহ্মবিকাশ চোংদারকে ম্যানেজ করে। এখন উঠে পড়—ছ'টা বাজে কুইক?

'আমি যাব না।'

'তোকে যেতেই হবে। নইলে এক থাপ্পড়ে তোর কান—'

'কানপুরে পাঠিয়ে দেব।'

'ইয়া! একদম কারেক্ট! ওঠ—কুইক—কুইক—'

কী করা যায়, যেতেই হল ব্রহ্মবিকাশের বাড়িতে। টেনিদা যা বলেছিল ঠিক তাই। সেই বাড়ি, সেই আধবুড়ো চাকর, সেই ডাইনিং হল। চেয়ারে ব্রহ্মবিকাশ চোংদার। আর টেবিলে—

সে আর কী বলব। দেখলেই মনে হয় ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু হাসি-হাসি মুখে ব্রহ্মবিকাশ তাকিয়ে আছেন—তিনি সবাইকে খেতে ডাকবেন, অথচ কাউকে খেতে দেবেন না। এরকম যাচ্ছেতাই লোক যে সংসারে থাকতে পারে আমি জানতুম না।

ব্রহ্মবিকাশ মুচকি মুচকি হাসছিলেন আর রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল! বললেন, 'তুমিই বুঝি প্যালারাম? শিঙ্গি মাছ দিয়ে পটোলের ঝোল খেতে বুঝি খুব ভালোবাসো?

বললুম, 'সে আগে খেতুম—ছেলেবেলায়। এখন কালিয়া-কাবাব কোর্মা খেয়ে থাকি।'

'ভালো—ভালো। আরে মানুষ তো খাওয়ার জন্যেই বেঁচে থাকে। এসো, লেগে যাও। কম্পিটিশ্যন হোক। দেখা যাক, কে আগে যেতে পারে।'

টেনিদা আমার গা টিপল।

তারপর যা হল, সংক্ষেপে বলি।

একটা গরম গরম ফুলকপির সিঙ্গাড়ায় সবে কামড় বসিয়েছি,

হঠাৎ ব্রহ্মবিকাশ বললেন, 'একটা কাণ্ড হয়েছে শোনো। এক লোকের খুব নাক ডাকত। তার ঘরে চোর ঢুকেছে। আর তক্ষুণি একটা গুবরে পোকা বোঁ করে উড়ে বসেছে লোকটার নাকে। তার নাক ডাকার ধাক্কায় গুবরে পোকাটা বুলেটের মতো ঠিকরে গিয়ে ঠকাস করে চোরটার কপালে—'

বলার কায়দাই এমনি যে তক্ষুণি স্রেফ আমার অপঘাত ঘটে যেত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার হাঁটুতে টেনিদার এক রামচিমটি আর আমিও টেনিদার পিঠে আর এক মোক্ষম চিমটি। দুজনেই একসঙ্গে চ্যাঁ করে উঠলুম।

ব্রহ্মবিকাশ কেমন বোকা বনে গেলেন; তক্ষুণি থেমে গেল গপ্পোটা।

'অ্যা—কী হল তোমাদের ?'

আমার হাঁটু জ্বালা করছিল, টেনিদারও যে খুব আরাম লাগছিল তা নয়! উচ্ছে খাওয়া মুখে টেনিদা বললে, 'আজ্ঞে—ইয়ে—হচ্ছে কি, হাসির গপ্পো শুনলেই আমাদের কেমন কান্না পায়।'

'পায় বইকি। শিব্রামের গপ্পো পড়তে গেলেই তো প্যালার দাঁত-কপাটি লাগে। আমি তো সুকুমার রায়ের পাগলা দাশু পড়ে এত কেঁদেছিলুম যে বাড়িময় জল থই থই।'

'অ্যাঁ!'

ব্রহ্মবিকাশ সামলে নিতে চেষ্টা করলেন, সেই ফাঁকে আমাদের হাত চলতে লাগল! তারপরেই 'এহে—ভারী দুঃখের কথা' বলে, ভীষণ ব্যাজার হয়ে দুটো চিংড়ির কাটলেটে টান দিলেন, টেনিদা আবার একটা তাঁর হাত থেকে প্রায় কেড়ে আনল।

ব্রহ্মবিকাশ বোধহয় আর একটা কিছু ঠাওরাতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ টেনিদা বললে, 'ব্রহ্মবিকাশবাবু।'

প্রাণপণে কাটলেট চিবুতে চিবুতে ব্রহ্মবিকাশ বললেন, অ্যাঁ?

'আপনি তো হাসির গপ্পো জানেন, আমি খুব ভালো ম্যাজিক, জানি।'

'অ্যাঁ!'

'এই যে দুটো জলের গেলাস দেখছেন, দূর থেকে এই গেলাসের জল আমি বদলে দেব। কখনো লাল হয়ে যাবে, কখনো নীল, কখনো হলদে, কখনো বেগুনী, কখনো সবুজ। শুধু মন্তর পড়ে।'

শুনে ব্রহ্মবিকাশের চিবুনি থেমে গেল।

'অ্যাঁ! তাও কি হয় নাকি? পি-সি সরকার হলে নাকি হে?'

'পি-সি সরকার! তিনি তো আমার কাছে এটা শেখবার জন্যে ঝুলোঝুলি, আমিই শেখাইনি। দেখতে চান ম্যাজিকটা? নিন—হাত পাতুন. না—না—উলটো করে দু-হাতের পাতা মেলে দিন টেবিলের ওপর। ইয়া—কারেকট।'

ব্রহ্মবিকাশ কিছু না বুঝেই হাতের পাতা উবুড় করে টেবিলে মেলে দিয়েছিলেন। তিনি জানলেন না যে কী হারাইতেছেন! এবং পত্রপাঠ টেনিদা দুটো জলভরতি গ্লাস তাঁর দু-হাতের চেটোয় বসিয়ে দিলে।

'ধরে থাকুন—ধরে থাকুন। ধৈর্য ধরে বসে থাকুন; আস্তে আস্তে জল নীল হবে—লাল হবে—হলদে হবে—বেগুনী হবে—প্যালা, কুইক কুইক!'

আর বলবার অপেক্ষা রাখে? আমি তখন কুইক নই—কুইকেস্ট! আর টেনিদা চালাচ্ছিল একেবারে জেট-প্লেনের স্পীডে।

ব্রহ্মবিকাশ হাহাকার করে উঠলেন।

'আরে—আরে—'

'আরে—আরে নয়, চুপ করে বসে থাকুন। এ-সব ম্যাজিকে একটু সময় লাগেই স্যার। অনেক হাসির গপ্পো শুনিয়েছেন; আজ একটু ম্যাজিক দেখুন। হাত নাড়তে চেষ্টা করলে আপনার দামী গেলাসেরই বারোটা বাজবে, আমার কী! হবে—হবে—নীল হবে, লাল হবে—সবুজ হবে—সব হবে! একটু ধৈর্য্য ধরুন; হাসি-হাসি

মুখে বসে থাকুন, ভাবতে চেষ্টা করুন হোকাস-পোকাস-গিলি-গিলি! প্যালা—কুইক—কুইক—'

গেলাসের মায়ায় ব্রহ্মবিকাশ হাঁ করে বেকুবের মতো বসে রইলেন, চাকরটাকে ডাকবার কথা পর্যন্ত তাঁর আর মনে এলো না। আর সেই ফাঁকে আমরা—

না—না, আমরা একেবারে ছোটলোক নই। উনি যে চিংড়ির কাটলেটটা আধখানা খেয়েছিলেন, সেটা ওঁর জন্যেই রেখে এসেছিলুম।

ঘুঁটেপাড়ার সেই ম্যাচ

তিন

চোরবাগান টাইগার ক্লাবের সঙ্গে পটলডাঙ্গা থাণ্ডার ক্লাবের ফুটবল ম্যাচ হয়ে গেল। প্রথমে টাইগার ক্লাব ঝাঁ-ঝাঁ করে আমাদের ছ'টা গোল ঢুকিয়ে দিলে, ওদের সেই ট্যারা ন্যাড়া মিত্তির একাই দিলে পাঁচখানা। আর বাকিটা দিলে আমাদের ব্যাক্ বলটুদা—সেমসাইডে।

তারপরেই পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাব পর পর ছ'টা গোল দিয়ে দিলে; টেনিদা দুটো, ক্যাবলা তিনটে, দলের সবচেয়ে ছোট্টা আর বিচ্ছু ছেলে কম্বল দিলে একটা। তখন ভারী একটা গোলমাল বেধে গেল, আর খেলাই হল না—রেফারী ফুরর করে হুইসিল বাজিয়ে খেলা শেষ করে দিলেন।

ব্যাপারটা এই:

আমাদের গোলকীপার পাঁচুগোপাল চশমা পরে। সেদিন ভুল করে ওর পিসিমার চশমা চোখে দিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। তারপরে আর কী—একসঙ্গে তিনদিকে তিনটে বল দেখতে পায়, ডাইনের

বলটা ঠেকাতে যায় তো বাঁয়েরটা গোল হয়ে যায়। বলটুদা আবার বুদ্ধি করে একটা ব্যাক পাস করেছিল, তাতে করে একটা সেমসাইড।

এখন হল কী, ছ'টা গোল দিয়ে টাইগার ক্লাব কি রকম নার্ভাস হয়ে গেল। আনন্দের চোটে ওদের তিনজন খেলোয়াড় অজ্ঞান হয়ে পড়ল, বাকীরা কেবল লাফাতে লাগল, সেই ফাঁকে ছ'টা বল ফেরৎ গেল ওদের গোলে। তখন সেই ফূর্তির চোট লাগল থাণ্ডার ক্লাবে—আর কে যে কোন্ দলে খেলছে খেয়ালই রইল না। টেনিদা বেমক্কা হাবুল সেনকেই ফাউল করে দিলে, আর হ্যাড়া মিত্তির তখন নিজেদের গোলে বল ঢোকাবার জন্যে মরিয়া—থাণ্ডার ক্লাবের দু-জন তাকে জাপটে ধরে মাঠময় গড়াগড়ি খেতে লাগল। ব্যাপার দেখে রেফারী খেলা বন্ধ করে দিলেন, আর কোত্থেকে একটা চোঙা এনে সমানে ভাঙা গলার চ্যাঁচাতে লাগলেন: 'ড্র—ড্র—ড্রন গেম—এক্ষুণি সব মাঠ থেকে কেটে পড়ো, নইলে, পুলিশ ডাকব—হুঁ!'

সেদিন সন্ধ্যের পর এই নিয়ে দারুণ আলোচনা চলছিল আমাদের ভেতরে। হঠাৎ টেনিদা বললে, ছোঃ, বারোটা গোল আবার গোল নাকি? একবার একাই আমি বত্রিশটা গোল দিয়েছিলুম একটা ম্যাচে।

অ্যাঁ! চুয়িং গাম চুবুতে চিবুতে ক্যাবলা একটা বিষম খেলো। হাবুল বললে, হ, ফাঁকা গোলপোস্ট পাইলে আমিও বায়ান্নখান গোল দিতে পারি।

—নো স্যার, নো ফাঁকা গোল বিজনেস! দু-দলে এ ডিভিসন বি ডিভিসনের কম্‌সে কম বারোজন প্লেয়ার ছিল! যা-তা খেলা তো নয়—ঘুঁটেপাড়া ভার্সাস বিচালিগ্রাম।

—খেলাটি কোথায় হয়েছিল?

—ঘুঁটেপাড়ায়! কী পেলে, ইউসেবিয়ো, মূলার নিয়ে লাফালাফি করিস! জীবনে একটা ম্যাচে কখনো বত্রিশটা গোল দিয়েছে তোদের রিভেরা, জেয়ার-জিনহো? ববি চার্লটন তো আমার কাছে বেবি রে।

—একটা মোক্ষম চাল মারতাছে—,বড় বিড় করে আওড়ালো হাবুল সেন।

হাবলার কপাল ভালো যে টেনিদা সেটা ভালো করে শুনতে পেলো না। বললে, কী বললি, মোক্ষদা মাসী? কী করে জানলি রে? ওই মোক্ষদা মাসীর বাড়ীতেই তো আমি গিয়েছিলুম ঘুঁটেপাড়ায়। সেইখানেই তো দারুণ ম্যাচ। কিন্তু মোক্ষদা মাসীর খবর তোকে বললে কে?

আমি জানি—হাবুল পণ্ডিতের মত হাসল।

ওর ওস্তাদী দেখে আমার রাগ হয়ে গেল। বললুম, বল্ দেখি ঘুঁটেপাড়া কোথায়?

—ঘুইট্যাপাড়া আর কোথায় হইবো? গোবরডাঙার কাছেই। গোবর দিয়াই তো ঘুইটা হয়।

ইয়াহ্! টেনিদা এত জোরে হাবুলের পিঠ চাপড়ে দিলে যে হাবুল চ্যাঁ করে উঠল। নাকটাকে জিভেগজার মতো উঁচু করে টেনিদা বললে, প্রায় ধরেছিস। তবে ঠিক গোবরডাঙার কাছে নয়, ওখান থেকে দশমাইল হেঁটে, তুই মাইল দৌড়ে—

দৌড়োতে হয় কেন?—ক্যাবলা জানতে চাইল।

—হয়, তাই নিয়ম। অত কৈফিয়ৎ চাস্‌নি বলে দিচ্ছি। ওখানে সবাই দৌড়োয়। হল?

ক্যাবলা বললে, হল। আর পথের বিবরণ দরকার নেই, গল্পটা বলো।

গল্প।—টেনিদা মুখটাকে গাজরের হালুয়ার মত করে বললে, এমন একটা জলজ্যান্ত সত্যি ঘটনা, আর তুই বলিস গল্প! শীগ্‌গীর উইথড্র কর—নইলে এক চড়ে তোর নাক—

আমি বললুম, নাগপুরে উড়ে যাবে।

ক্যাবলা বললে, বুঝেছি।. আচ্ছা আমি উইথড্র করলুম। কিন্তু টেনিদা—ইংরিজীতে উচ্চারন উইথড্র নয়।

আবার পণ্ডিতী।—টেনিদা গর্জন করল ঃ টেক কেয়ার ক্যাব্‌লা, ফের যদি বিচ্ছিরি একটা কুরুবকের মতো বকবক করবি তো এক্ষুণি একটা পুঁদিচ্চেরি হয়ে যাবে—বলে দিচ্ছি তোকে। যা—শিগ্‌গীর আট আনার ঝাল-মুড়ি কিনে আন—তোর ফাইন!

আলুভাজা-আলুভাজা মুখ করে ক্যাবলা ফাইন আনতে গেল। ওর দুর্গতিতে আমরা কেউ দুঃখিত হলুম না—বলাই বাহুল্য। সব কথাতেই ক্যাব্‌লা ওরকম টিকটিকির মতো টিকটিক করে।

বুঝলি—ঝালমুড়ি চিবুতে চিবুতে টেনিদা বলতে লাগল ঃ ছদিনের জন্যে তো বেড়াতে গেছি মোক্ষদা মাসীর বাড়ীতে। মেসোমশাই ব্যবসা করেন আর মাসীমা যা রাঁধেন না, খেলে অজ্ঞান হয়ে যাবি। মাসীর রান্না বাটি-চচ্চড়ি একবার খেয়েছিস তো ওখান থেকে নড়তেই চাইবি না—ঘুঁটেপাড়াতেই ঘুঁটের মতো লেপটে থাকবি।

আমার খুব মনের জোর, তাই বাটি-চচ্চড়ি আর ক্ষীরপুলির লোভ কাটিয়েও কলকাতায় ফিরে আসি। সেবারেও গেছি—দুটো দিন একটু ভালোমন্দ খেয়ে আসতে। ভরা শ্রাবণ, থেকে থেকেই ঝুপঝাপ বৃষ্টি। সেদিন সকালে মাসীমা তালের বড়া ভেজে ভেজে তুলছেন আর আমি একটার পর একটা খেয়ে যাচ্ছি, এমন সময় ক'টা ছেলে এসে হাজির।

অনেকবার তো ঘুঁটেপাড়ায় যাচ্ছি, ওরা সবাই আমায় চেনে। বললে, 'টেনিবাবু, বড়ো বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এলুম। আজ বিকেলে শিবতলার মাঠে বিচালিগ্রামের সঙ্গে আমাদের ফুটবল ম্যাচ। ওরা ছ'জন প্লেয়ার কলকাতা থেকে হায়ার করেছে, আমরাও ছ'জন এনেছি। কিন্তু মুশকিল হল, আমাদের এখানকার একজন জাঁদরেল খেলোয়াড় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আপনাকেই আমাদের উদ্ধার করতে হচ্ছে দাদা।'

জানিস তো, লোকের বিপদে আমার হৃদয় কেমন গলে যায়। তবু একটু কায়দা করে বললুম, 'সব হায়ার করা ভালো ভালো প্লেয়ার,

ওদের সঙ্গে কি আর আমি খেলতে পারব ? তা ছাড়া এ বছরে তেমন ফর্ম নেই আমার।' ওরা তো শুনে হেসেই অস্থির।

'কী যে বলেন স্যার, আপনি পটলডাঙার টেনিরাম শর্মা—আপনার ফর্ম তো সব কাজে, সব সময়েই থাকে। প্রেমেন মিত্তিরের ঘনাদা, হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত, শিব্রামের হর্ষবর্ধন—এদের ফর্ম কখনো পড়তে দেখেছেন ?' আমি হাতজোড় করে প্রণাম করে বললুম, 'ঘনাদা, জয়ন্ত, হর্ষবর্ধনের কথা বলবেন না—ওঁরা দেবতা—আমি তো স্রেফ নস্যি। ওঁরা যদি গরুড় পাখি হন, আমি স্রেফ চড়ুই।'

ওরা বললে, 'অত বুঝিনে দাদা, আপনাকে ছাড়ছিনে। আমাদের ধারণা মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল তো তুচ্ছ—আপনি ইচ্ছে করলে বিশ্ব একাদশে খেলতে পারেন। আর আপনি যদি চড়ুই পাখী হন, আমরা তো তা হলে—কি বলে মশা!'

আমি বললুম, 'ঘুঁটেপাড়ার মশাকে তুচ্ছ করবেন না মশাই, এক-একটা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা।'

ওরা হেঁ-হেঁ করে চলে গেল, কিন্তু আমাকে রাজী করিয়েও গেল। আমার ভীষণ ভাবনা হল রে। থাণ্ডার ক্লাবে যা খেলি—তা খেলি, কিন্তু অতগুলো এ-ডিভিশন বি-ডিভিশন খেলোয়াড়ের সামনে! ওরা না হয় আপ করে গেল, কিন্তু আমি দাঁড়াব কী করে ?

কিন্তু ফিরিয়েও তো দেওয়া যায় না। আমার নিজের প্রেস্টিজ—পটলডাঙার প্রেস্টিজ সব বিপন্ন! কোন দেবতাকে ডাকি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মা নেংটীশ্বরীকে মনে পড়ে গেল। আরে সেই নেংটীশ্বরী—আরে সেই যে রে—"কম্বল নিরুদ্দেশে"র ব্যাপারে যে দেবতাটির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে বলতে লাগলুম, এ বিপদে তুমিই দয়া করো মা—গোটা কয়েক নেংটি ইঁদুর পাঠিয়ে দাও তোমার—খেলার সময় ওদের পায়ে কুটুর কুটুর করে কামড়ে দিক। নিদেন পক্ষে পাঠাও সে "অবকাশরঞ্জিনী" বাদুড়কে—সে ওদের সকলের চাঁদি ঠুকরে বেড়াক।

এ-সব প্রার্থনা-ট্রার্থনা করে—শ-দেড়েক তালের বড়া খেয়ে আমার বেশ একটা তেজ এসে গেল। কেবল মনে হতে লাগল, আজ একটা এস্‌পার-ওস্‌পার হয়ে যাবে। তখন কি জানি, গুণে গুণে বত্রিশটা গোল দিতে পারব, আমি একাই ?

বিকেলে আকাশ জুড়ে কালো কালো হাতির পালের মতো মেঘ। মনে হল, দুর্দান্ত বৃষ্টি নামবে। তবু মাঠে গিয়ে দেখি বিস্তর লোক জড়ো হয়ে গেছে। এক দল হাঁকছে : 'বিচালিগ্রাম—হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে—আর এক দল সমানে উত্তর চড়াচ্ছে : 'ঘুটেপাড়া—হ্যাপ্‌-হ্যাপ্‌-হ্যার্‌রে !

ক্যাবলা হঠাৎ আঁৎকে উঠল—হ্যাপ্‌-হ্যাপ্‌-হ্যার্‌রে মানে কী ? কখনো তো শুনিনি।

—ওটা ঘুঁটেপাড়ার নিজস্ব স্লোগান। ওরা হিপ্‌-হিপ্‌ বলছে কিনা, তাই পালটা জবাব। ওরাও যদি হিপ্‌-হিপ্‌ করে, তা হলে এরা বলবে না, এদের নকল করছে ? ওরা যদি বলত বিচালিগ্রাম জিন্দাবাদ—এরা সঙ্গে সঙ্গে বলত—ঘুঁটেপাড়া মুর্দাবাদ।

—অ্যাঁ, মুর্দাবাদ ! নিজেদেরই ?

—হ্যাঁ, নিজেদেরই। পরের নকল করে অপমান হওয়ার চাইতে মরে যাওয়া ভালো—বুঝলি না ?

—বিলক্ষণ ! আচ্ছা—বলে যাও।

—এতেই বুঝতে পারছিস, দুটো গ্রামে রেষারেষি কি রকম। দারুণ চিৎকারের মধ্যে তো খেলা শুরু হল। দু-মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারলুম, বিচালিগ্রামকে এঁটে ওঠা অসম্ভব। এরা দু'জনই এ ডিভিশনের প্লেয়ার এনেছে—খেলায় তাদের আগুন ছোটে। আর ওদের গোলকীপার ! সে একেবারে ছ'হাত লাফিয়ে ওঠে, তার লম্বা লম্বা হাত বাড়িয়ে বল তো বল, বন্দুকের গুলি অবদি পাকড়ে নিতে পারে।

ঘুঁটেপাড়ায় মাত্র দুজন এ-ডিভিশনের, বাকী চারজনই বি-ডিভিশনের। এ-মার্কা দুজনও ওদের তুলনায় নীরেস। খেলা শুরু হতে না হতেই বল এসে একেবারে ঘুঁটেপাড়ার ব্যাক লাইনে চেপে পড়ল, মাঝ মাঠও আর পেরোয় না। আর ওদের গোলকীপার শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল : 'একটা বালিস আর সতরঞ্চি দাও হে —একটু ঘুমিয়ে নেব।'

আমি আর কী করব—মিড-ফিল্ডে দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়েই আছি। নিতান্তই ঘুঁটেপাড়ার বাকী দশজনই ডিফেন্স লাইনে দাঁড়িয়ে আছে তাই গোল হচ্ছে না—কিন্তু দেখতে দেখতে ওরা গোটা পাঁচেক কর্ণার কিক পেয়ে গেল। আর কতক্ষণ ঠেকাবে!

আমি তখনো মা নেংটীশ্বরীকে ডাকছি তো ডাকছিই। এমন সময় আকাশ ভেঙে ঝমঝম বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি যে চারিদিক অন্ধকার। কিন্তু পাড়াগেঁয়ে লোক, আর কলকাত্তাই খেলোয়াড়ের গোঁ—খেলা দাপটে চলতে লাগল। বল জলে ভাসছে—ধপাধপ আছাড়—এই ফাঁকেও পর-পর দুখানা গোল খেয়ে গেল ঘুঁটেপাড়া।—ভাবলুম— যাঃ, হয়ে গেল!'

বিচালিগ্রাম তারস্বরে চিৎকার করছে, হঠাৎ এদিকের লাইন্সম্যান ফ্ল্যাগ ফেলে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বললে, শিবতলার পুকুর ভেসেছে রে—মাঠ ভর্তি মাছ!

অ্যাঁ—মাছ!

দেখতে দেখতে যেন ম্যাজিক। গাঁয়ের লোকে বর্ষায় পুকুর-ভাসা মাছ তো ধরেই, কলকাতার ছেলেগুলোও আনন্দে ক্ষেপে গেল। রইল খেলা, রইল বিচালিগ্রাম আর ঘুঁটেপাড়ার কম্পিটিশন—তিন শো লোক আর একুশজন খেলোয়াড়, দুজন লাইন্সম্যান—সবাই কপাকপ মাছ ধরতে লেগে গেল। প্লেয়াররা জার্সি খুলে ফেলে তাতেই টকাটক মাছ তুলতে লাগল। খেলতে আর বয়ে গেছে তাদের।

'এই রে, মস্ত একটা শোল মাছ পাকড়েছি।'

'আরে—একটা বাটা মাছের ঝাঁক যাচ্ছে রে।'

'ঈস্—কী বড়ো বড়ো কই মাইরি! ধর্—ধর্—'

সে যে একখানা কী কাণ্ড, তোদের আর কী বলব! খেলার মাঠ ছেড়ে ক্রমেই দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সবাই। শেষে দেখি, মাঠে আমরা দুজন। আমি আর রেফারী।

রেফারী ওখানকার স্কুলের ড্রিল-মাস্টার। বেজায় মারকুটে, ভীষণ রাগী। দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কী? ইয়ু গো অন্ প্লেয়িং!'

ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, 'আমি একাই খেলব?'

'ঈয়েস—একাই খেলবে। আমি তো খেলা বন্ধ করিনি।'—ধমক দিয়ে রেফারী বললেন, 'খেলো। প্লেয়াররা মাঠ ছেড়ে মাছ ধরতে দৌড়োলে খেলা বন্ধ করে দিতে হবে, রেফারীগিরির বইতে এমন কোনো আইন নেই।'

তখন শুরু হল আমার গোল দেবার পালা। একবার করে বল নিয়ে গিয়ে গোল দিয়ে আসি, আর রেফারী ফুর্র্ করে বাঁশি বাজিয়ে আবার সেণ্টারে নিয়ে আসে। এই-ই চলতে লাগল।

ওদের দু-একজন বোধ হয় টের পেয়ে ফেরবার কথা ভাবছিল, এমন সময় মা নেংটীশ্বরীর আর এক দয়া। মাঠের কাছেই ছিল সারে সারে তালগাছ। হঠাৎ হু-হু করে ঝোড়ো হাওয়া, আর ঝপাস-ঝপাস করে পাকা তাল পড়তে লাগল।

'তাল পড়ছে—তাল পড়ছে—'

যারা ফিরতে যাচ্ছিল, তারা প্রাণপণে ছুটল তাল কুড়োতে।

এর মধ্যে আমি যা গোল দেবার দিয়েছি—মানে গুণে গুণে বত্রিশটি। আমি গুণছি না, গোল দিতে দিতে আমার মাথা বোঁ-বোঁ করছে, আর ওই ভারী ভেজা বল বার বার সেণ্টার থেকে জলের ওপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি—চাড্ডিখানা কথা নাকি! একবার বলেছিলুম, 'অনেক তো গোল দিয়েছি স্যার, আর পারছি না—পা

ব্যথা করছে!' রেফারী আমায় তেড়ে মারতে এলেন, বিকট মুখে ভেংচে বললেন, 'ইয়ু গো অন্ গোলিং—আই সে!'

গোলিং আবার ইংরেজী হয় নাকি—ক্যাব্‌লা বলতে যাচ্ছিল, টেনিদা একটা বাঘা ধমক দিয়ে বললে, ইয়ু শাট্ আপ! যে মারকুটে মাস্টার, তার ইংরেজীর ভুল ধরবে কে? আমি গোল দিচ্ছি আর উনি গুণেই যাচ্ছেন, 'থার্টি—থার্টিওয়ান—থার্টিটু—'

'ওরে গোল দিচ্ছে বুঝি—' বলে ওদের সেই গোলকীপারটা দৌড়ে এল। সে যে রকম জাঁদরেল, হয়তো একাই বত্রিশটা গোল ফেরত দিত, আমি আটকাতে পারতুম না—বেদম হয়ে গেছি তখন। কিন্তু রেফারী তক্ষুণি ফাইন্যাল হুইসেল বাজিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, 'খেলা ফিনিস।' তারপর আমাকে বললেন, 'এখন যাও—কই মাছ ধরো গে, তাল কুড়োও গে।'

কিন্তু তখন কি আর মাছ, তাল কিছু আছে? খেলা ফিনিসের সঙ্গে তাও ফিনিস! অতগুলো লোক!

টেদিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: 'তখন প্রাণের আনন্দে মাছ ধরে আর তাল কুড়িয়ে বিচালিগ্রাম চিল্লোতে লাগল: থ্রী চিয়ার্স ফর বিচালিগ্রাম, আর ঘুঁটেপাড়া চ্যাঁচাতে লাগল: থ্রী টীয়ার্স ফর ঘুঁটেপাড়া!'

টীয়ার্স? মানে চোখের জল?—ক্যাবলা আবার বিস্মিত হল। হাঁ—হাঁ—টীয়ার্স। পালটা জবাব দিতে হবে না? সে যাক। কিন্তু একটা ম্যাচে একাই বত্রিশটা গোল দিলুম, পেলে-ইউসেবিয়ো-রিভেরা-চার্লটন সব কাৎ করে দিলুম, কিন্তু একটা কই মাছ, একটা তালও পেলুম না—এ দুঃখ মরলেও আমার যাবে না রে!—আবার বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টেনিদা।

টিক্‌টিকির ল্যাজ

চার

ক্যাবলাদের বসবার ঘরে বসে রেডিওতে খেলার খবর শুনছিলুম আমরা। মোহনবাগানের খেলা। আমি, টেনিদা আর ক্যাবলা খুব মন দিয়ে শুনছিলুম, আর থেকে থেকে চিৎকার করছিলুম—গো-গো—গোল। দলের হাবলু সেন হাজির ছিলো না—সে আবার ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। মোহনবাগানের খেলায় হাবলার কোনো ইণ্টারেস্ট নেই।

কিন্তু চেঁচিয়েও বেশি সুবিধে হলো না—শেষ পর্যন্ত একটা পয়েণ্ট। আমাদের মন-মেজাজ এমনি বিচ্ছিরি হয়ে গেল যে, ক্যাবলার মা'র নিজের হাতে তৈরী গরম গরম কাটলেটগুলো পর্যন্ত খেতে ইচ্ছে করছিলো না। এই ফাঁকে টেনিদা আমার প্লেট থেকে একটা কাটলেট পাচার করলো—মনের দুঃখে আমি দেখেও দেখতে পেলুম না।

কিছুক্ষণ উদাস হয়ে থেকে ক্যাবলা বললে, দ্যুৎ!

আমি বললুম, হুঁ!

টেনিদা হাড়-টাড় সুদ্ধ চিবিয়ে কাটলেটগুলো শেষ করলো, তারপর কিছুক্ষণ খুব ভাবুকের মতো চেয়ে রইলো সামনের দেয়ালের দিকে। একটা মোটা সাইজের টিকটিকি বেশ একমনে কুপ-কুপ করে পোকা খাচ্ছিল, তাকে লক্ষ্য করতে করতে টেনিদা বললে, ওই যে!

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ওই যে, কী?

—মোহনবাগান।

—মোহনবাগান মানে ?

—টিক্‌টিকি। মানে টিক্‌টিকির ল্যাজ।

শুনে আমি আর ক্যাবলা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম, খবর্দার টেনিদা, মোহনবাগানের অপমান কোরো না।

টেনিদা নাক-টাক কুঁচকে মুখটাকে পাঁপর ভাজার মতো করে বললে, আরে খেলে যা! বললুম কী, আর কী বুঝলো এ দুটো!

—এতে বোঝবার কী আছে শুনি! তুমি মোহনবাগানকে টিক্‌টিকির ল্যাজ বলছো—

—চুপ কর প্যালা—মিথ্যে কুরুবকের মতো বক্‌বক্ করিস নি। যদি বাবা কচুবনেশ্বরের কথা জানতিস তা হলে বুঝতিস—টিক্‌টিকির রহস্য কী!

—কচুবনেশ্বর। সে আবার কী? এবার ক্যাবলার জিজ্ঞাসা।

—সে এক অত্যন্ত ঘোরালো ব্যাপার। যাকে ফরাসী ভাষায় বলে পুঁদিচ্চেরী।

—পুঁদিচ্চেরী তো পণ্ডিচেরী! সে তো একটা জায়গার নাম।—ক্যাবলা প্রতিবাদ করলো।

—শাট আপ! জায়গার নাম। টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, ভারী ওস্তাদ হয়ে গেছিস যে! আমি বলেছি যে, পুঁদিচ্চেরী মানে ব্যাপার অত্যন্ত সাংঘাতিক-বাস! এ নিয়ে তক্কো করবি তো এক চড়ে তোর কান—

আমি বললুম—কানপুরে উড়ে যাবে!

—রাইট!—টেনিদা গম্ভীর হয়ে বললে, এবার তা হলে বাবা কচুবনেশ্বরের কথাটা বলি। ঠাকুর-দেবতার ব্যাপার, খুব ভক্তি করে শুনবি। যদি তক্ক-টক্ক করিস তা হলে···

আমরা সমস্বরে বললুম—না—না।

টেনিদা শুরু করলো।

সেবার গরমের ছুটিতে সেজো পিসীমার কাছে বেড়াতে গেছি ঘুঁটেপুকুরে। খাসা জায়গা। গাছে গাছে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা—

আমি বললুম—আহা শুনেই যে লোভ হচ্ছে। ঘুঁটেপুকুরটা কোথায় টেনিদা ?

ক্যাবলা ব্যাজার হয়ে বললে—আঃ, গল্প থামিয়ে দিস নে। ঘুঁটেপুকুর কোথায় হবে আবার ? নিশ্চয় গোবরডাঙার কাছাকাছি !

টেনিদা বললে—না, গোবরডাঙার কাছে নয়। রাণাঘাট ইস্‌টিশন থেকে বারো মাইল দূরে। দিব্যি জায়গা রে। চারিদিকে বেশ শ্যামল প্রান্তর-টান্তর—পাখীর কাকলি-টাকলি কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু তারো চাইতে বেশি আছে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা। খেয়ে খেয়ে আমার গা থেকে এমনি আম-কাঁঠালের গন্ধ বেরুতো যে, রাস্তায়, আমার পেছনে পেছনে আট-দশটা গরু বাতাস শুঁকতে শুঁকতে হাঁটতে থাকত। একদিন তো—কিন্তু না, গরুর গল্প আজ আর নয় —বাবা কচুবনেশ্বরের কথাই বলি।

হয়েছে কি জানিস, আমি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুঁটেপুকুর ফুটবল ক্লাব তো আমায় লুফে নিয়েছে। আমি পটলডাঙার থাণ্ডার ক্লাবের ক্যাপ্টেন—একটা জাঁদরেল সেন্টার ফরোয়ার্ড—সেও ওদের জানতে বাকী নেই।

দু দিন ওদের সঙ্গে খেলেই বুঝতে পারলুম—ওদের নাম হওয়া উচিত ছিলো বাতাবি নেবু স্পোর্টিং ক্লাব। মানে বাতাবি নেবু পর্যন্তই ওদের দৌড়, ফুটবলের পা ছোঁয়াতে পর্যন্ত শেখেনি। কিছুদিন তালিম-টালিম দিয়ে একরকম দাঁড় করানো গেল। তখন ঘুঁটেপুকুরে পাঁচুগোপাল কাপের খেলা চলছিলো। বললে বিশ্বাস করবি নে, আমার তালিমের চোটে ঘুঁটেপুকুর ক্লাব তিন তিনটে গেঁয়ো টিমকে হারিয়ে দিয়ে একেবারে ফাইন্যালে পৌঁছে গেল। অবশ্যি সব ক’টা গোল আমিই দিয়েছিলুম।

ফাইন্যালে উঠেই ল্যাঠা বাধলো।

ওদিক থেকে উঠে এসেছে চিংড়িহাটা হিরোজ—মানে এ তল্লাটের সবচেয়ে জাঁদরেল দল। তাদের খেলা আমি দেখেছি। এদের মতো আনাড়ী নয়—এক-আধটু খেলতে-টেলতে জানে। সবচেয়ে মারাত্মক ওদের গোল-কীপার বিল্‌টে ঘোষ। বল তো দূরের কথা, গোলের ভেতরে মাছি পর্যন্ত ঢুকতে গেলে কপাৎ করে লুফে নেয়। আর তেমনি তাগড়াই জোয়ান—কাছে গিয়ে চার্জ-ফার্জ করতে গেলে দাঁত-মুখ আস্ত নিয়ে ফিরতে হবে না।

স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, ঘুঁটেপুকুরের পক্ষে পাঁচুগোপাল কাপ নিতান্তই মরীচিকা!

ঘুঁটেপুকুর ক্লাব চুলোয় যাক—সেজন্যে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু আমি টেনি শর্মা, খাস পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাবের ক্যাপটেন—আসল কলকাতার ছেলে, আমার নাকের সামনে দিয়ে চিংড়িহাটা ড্যাং-ড্যাং করতে করতে কাপ নিয়ে যাবে! এ অপমান প্রাণ থাকতে সহ্য করা যায়? তার ওপর একমাস ধরে ঘুঁটেপুকুরের আম-কাঁঠাল এনতার খেয়ে চলেছি—একটা কৃতজ্ঞতাও তো আছে?

কিন্তু কী করা যায়!

দুপুরবেলা বসে বসে এইসব ভাবছি, এমন সময় শুনতে পেলাম, সেজো পিসীমা কাকে যেন বলছেন—বসে বসে ভেবে আর কী করবে—বাবা কচুবনেশ্বরের থানে গিয়ে ধন্না দাও।

কচুবনেশ্বর! ওই বিটকেল নামটা শুনেই কান খাড়া করলুম।

সেজো পিসীমা আবার বললেন—বাবার থানে ধন্না দাও—জাগ্রত দেবতা—তোমার ছেলে নির্ঘাৎ পরীক্ষায় পাশ করে যাবে।

গলা বাড়িয়ে দেখলুম, পিসীমা দত্ত-গিন্নীর সঙ্গে কথা কইছেন। দত্ত-গিন্নী বললেন—তাহলে তাই করবো, দিদি। হতচ্ছাড়া ছেলে

ছু-বার পরীক্ষায় ডিগবাজী খেলো, উনি বলেছিলেন এবারে-ও ফেল করলে লাঙলে জুড়ে চাষ করাবেন।

দত্ত-গিন্নীর ছেলে চাষ করুক—আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বাবা কচুবনেশ্বরের কথাটা কানে লেগে রইলো। আর দত্ত-গিন্নী বেরিয়ে যেতে না যেতেই আমি পিসীমাকে পাকড়াও করলুম।

—বাবা কচুবনেশ্বর কে পিসীমা ?

শুনেই পিসীমা কপালে হাত ঠেকালেন। বললেন—দারুণ জাগ্রত দেবতা রে! গাঁয়ের পুব দিকে কচুবনের মধ্যে তাঁর থান। পয়লা শ্রাবণ ওখানে মোচ্ছব হয়—কচু সেদ্ধ, কচু ঘণ্ট, কচুর ডালনা, কচুর অম্বল, আর কচুর পোলাও দিয়ে তাঁর ভোগ হয়।

টেনিদার গল্প শুনতে শুনতে আমার জানতে ইচ্ছে হলো, কচু-পোড়াটাই বা বাদ গেল কেন। কিন্তু ঠাকুর-দেবতাদের কচুপোড়া খেতে বললে নিশ্চয় তাঁরা চটে যাবেন—তাই ব্যাপারটা চেপে গেলুম। জিজ্ঞেস করলুম, কচুর পোলাও খেতে কেমন লাগে টেনিদা!

টেনিদা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বললে—আঃ, কচু খেলে যা! আমি কি কচুর পোলাও খেয়েছি নাকি যে বলবো! ইচ্ছে হয় পয়লা শ্রাবণ ঘুঁটেপুকুরে গিয়ে খেয়ে আসিস।

ক্যাবলা অধৈর্য হয়ে বললে, টিক-টিক করিস নে প্যালা, গল্পটা বলতে দে। তুমি থেমো না টেনিদা, চালিয়ে যাও।

টেনিদা বললে, সেজো পিসীমার ভক্তি দেখে আমারও দারুণ ভক্তি হলো। আর ভেবে ছাখ—কচু সেদ্ধ, কচু ঘণ্ট, কচুর অম্বল, কচুর কালিয়া—মানে এত কচু ম্যানেজ করা চাট্টিখানি কথা! আমার তো কচু দেখলেই গলা কুট-কুট করে। কচু ভোগের বহর দেখে মনে হলো, দেবতাটি তো সামান্যি নয়!

জিজ্ঞেস করলুম—বাবা কচুবনেশ্বরের কাছে ধর্ণা দিয়ে ফুটবল ম্যাচ জেতা যায়, পিসীমা?

পিসীমা বললেন—ফুটবল ম্যাচ বলছিস কি? বাবার অসাধ্য কাজ নেই। এই তো, ও বাড়ির মেন্টির মাথায় এমন উকুন হলো যে, তিনবার ন্যাড়া করে দিয়েও উকুন যায় না। কত মারা হলো, কত কবিরাজী তেল—উকুন যে কে সেই! শেষে মেন্টির মা কচুবনেশ্বরের থানে ধন্না দিয়ে আধ ঘণ্টা চুপ করে পড়ে থেকেছে—

ব্যস,—হাতে টুপ করে কিসের একটা শেকড় পড়লো। সেই শেকড় বেটে লাগিয়ে দিতেই একদিনে উকুন ঝাড়ে-বংশে সাফ। আর মেন্টির যা চুল গজালো—সে যদি দেখতিস! একেবারে হাঁটু পর্যন্ত।

আমি তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলুম। বললুম—বাবার থান কোন্ দিকে পিসীমা?

—ওই তো সোজা পুবদিক বরাবর—একেবারে নদীর ধারেই। কচুবনের ভেতরে বাবার থান, অনেক দূর থেকেই তো দেখা যায়। তুই সেখানে ধন্না দিতে যাবি নাকি রে? তোর আবার কী হলো?

—কিছু হয় নি—বলে—সোজা পিসীমার সামনে থেকে চলে এলুম। মনে মনে ঠিক করলুম, কাউকে জানতে দেওয়া নয়—চুপি চুপি একাই গিয়ে ঘণ্টাখানেক ধর্ণা দেবো। একটা শেকড়-টেকড় যদি পেয়ে যাই—বেটে খেয়ে নেবো, তারপর কালকের খেলায় আমাকে আর পায় কে? ওই ডাকসাইটে বিল্টে ঘোষের হাতের তলা দিয়েই তিন তিনখানা গোল ঢুকিয়ে দেবো।

একটু পরেই রামায়ণ খুলে সুর করে স্বূর্পনখার নাসাচ্ছেদন' পড়তে পড়তে পিসীমা যেই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি সোজা একেবারে কচুবনেশ্বরের খোঁজে বেরিয়ে পড়লুম।

বেশি হাঁটতে হলো না। আমবাগানের ভেতর দিয়ে সিকি মাইলটাক যেতেই দেখি সামনে একটা মজা নদী আর তার পাশেই কচুর জঙ্গল। সে কি জঙ্গল! দুনিয়াসুদ্ধ সব লোককে কচু ঘণ্ট খাইয়ে দেওয়া যায়—কচুপোড়া খাওয়ানোও শক্ত নয়, এমন বন

সেখানে। আর তারই মাঝখানে একটা ছোট মন্দিরের মতো—বুঝলুম ওইটেই হচ্ছে বাবার থান।

বন ঠেলে তো মন্দিরে পৌঁছানো গেল। কচুর রসে গা একটু চিড়বিড় করছিলো—কিন্তু ওটুকু কষ্ট না করলে কি আর কেষ্ট মেলে। গিয়ে দেখি, মন্দিরে মূর্তি-টুর্তি নেই—একটা বেদী, তার ওপর গোটা কয়েক রং চটা নয়া পয়সা, কিছু চাল, আর একরাশ কচুর ফুল শুকিয়ে রয়েছে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মন্দিরের বারান্দায় ধর্ণা দিলুম।

চোখ বুজে লম্বা হয়ে শুয়ে আছি। হাত দুটো মেলেই রেখেছি—কোন্ হাতে টুপ করে বাবার দান পড়বে বলা যায় না তো। পড়ে আছি তো আছিই—একরাশ মশা এসে পিন-পিন করে কামড়াচ্ছে—কানের কাছে গোটা দুই গুবরেপোকা ঘুরঘুর করছে, কচু লেগে হাত-পা কুট্‌কুট্ করছে। কিন্তু মশা তাড়াচ্ছি না, গা চুলকোচ্ছি না, খালি দাঁত-মুখ শিঁটিয়ে প্রাণপণে প্রার্থনা করছি—দোহাই বাবা কচুবনেশ্বর, একটা শেকড়-টেকড় চট্‌পট ফেলে দাও—চিংড়িহাটার বিল্‌টে ঘোষ-কে ঠাণ্ডা করে দিই। বেশি দেরী করো না বাবা—গা হাত ভীষণ চুলকোচ্ছে, আর দারুণ মশা। আর তা ছাড়া থেকে থেকে বনের ভেতর কী যেন খ্যাঁক-খ্যাঁক করে ডাকছে—যদি পাগলা শেয়াল হয় তা হলে এক কামড়েই মারা যাবো। দোহাই বাবা, দেরী করো না—যা দেবার দিয়ে দাও, কুইক্—কচুবনেশ্বর।

যেই বলেছি অমনি বাঁ হাতে কী যেন টপাস্ করে পড়লো।

'ইউরেকা' বলে যেই লাফিয়ে উঠেছি—দেখি শেকড়ের মতোই কী একটা পড়েছে বটে। কিন্তু এ কি। শেকড়টা তুরুক্ তুরুক্ করে অল্প অল্প লাফাচ্ছে যে।

মন্ত্রপূত জ্যান্ত শেকড় নাকি?

আর তখুনি মাথার ওপর ট্যাক্-ট্যাক্-টিকিস করে আওয়াজ

হলো। দেখি, ছটো টিকটিকি দেওয়ালের গায়ে লড়াই করছে—তাদের একটার ল্যাজ নেই। মানে, মারামারিতে খসে পড়েছে।

রহস্যভেদ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। তাহলে আমার হাতে শেকড় পড়ে নি—পড়েছে টিকটিকির কাটা ল্যাজ। টিপে দেখলুম রবারের মতো—আর অল্প অল্প নড়ছে তখনো।

ছর্বুদ্ধি হলে যা হয়—ভীষণ রাগ হয়ে গেল আমার। মনে হলো, বাবা কচুবনেশ্বর আমায় ঠাট্টা করলে। এতক্ষণ গায়ের কুটকুটুনি আর মশার কামড় সহ্য করে শেষে কিনা টিকটিকির ল্যাজ। গোঁ গোঁ করে উঠে পড়লুম। তক্ষুণি আবার সেই শেয়ালটা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে ডেকে উঠলো—মনে হলো এখানে থাকাটা আর ঠিক নয়। মন্দির থেকে নেমে কচুবন ভেঙে সোজা বাড়ী চলে এলুম—আধসের সর্ষের তেল মেখে এক ঘণ্টা পরে পায়ের জ্বলুনি খানিকটা বন্ধ হলো।

টেনিদা এই পর্যন্ত বলতে আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলুম না। ফস্ করে জিজ্ঞেস করলুম—সেই টিকটিকির ল্যাজটা কী হলো?

—আঃ থাম না—আগে থেকে কেন বাগড়া দিচ্ছিস? ফের যদি কথা বলবি, তা হলে দেওয়ালের ওই টিকটিকিটা পেড়ে তোর মুখে পুরে দেবো—বলে টেনিদা আমার দিকে বজ্রদৃষ্টিতে তাকালো।

ক্যাবলা বললে—ছেড়ে দাও ওর কথা, তুমি বলো।

—বলবার আর আছে কী!—টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেললো: ভুল যা হয়ে গেলো, তার শাস্তি পেলুম পরের দিনই।

ইস্কুলের মাঠে পাঁচুগোপাল কাপের ফাইন্যাল ম্যাচ। ঘুঁটেপুকুর ক্লাবকে বলেছি, প্রাণ দিয়েও কাপ জিততে হবে। আর সত্যি কথা বলতে কি—বাতাবি নেবু স্পোর্টিং আজ সত্যিই ভালো খেলছে—। এমন কি আমরা হয়তো ছ'একটা গোলও দিয়ে ফেলতে পারতুম—যদি ওই ছরন্ত-ছর্ধর্ষ বিলটে ঘোষটা না থাকত। আমাদের গোল-

কীপার প্যাঁচাও খুব ভালো খেলছে—দু-দুবার যা সেভ্ করলে দেখবার মতো।

হাফটাইম পর্যন্ত ড্র। কিন্তু বুঝতে পারছিলুম—ঘুঁটেপুকুরের দম ফুরিয়ে আসছে, পরের পঁচিশ মিনিট ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হবে। হাফ টাইম হওয়ার আগেই আমি একটা মতলব এঁটে ফেলেছিলুম। মাঠের ধারে বাদাম গাছ থেকে হাওয়ায় শুকনো পাতা উড়ে উড়ে পড়ছিলো, তাই দেখেই প্ল্যানটা এলো। মানে মতলবটা মন্দ নয়। কিন্তু জানিস্ তো, 'মারি অরি পারি যে কৌশলে!'

হাফ টাইম হতেই সেজো পিসীমার বাড়ীর রাখাল ভেট্‌কীর কানে কানে আমি একটা পরামর্শ দিলুম। ভেট্‌কীটা দেখতে বোকা-সোকা হলেও বেশ কাজের ছেলে। শুনেই একগাল হেসে সে দৌড় মারলো।

আবার খেলা আরম্ভ হলো। হওয়ায় বাদামের পাতা উড়ে আসছে, আমি আড়চোখে তা দেখছি আর ভাবছি ভেটকী কখন আসে। এর মধ্যে চিংড়িহাটা আমাদের দারুণ চেপে ধরেছে—জান কবুল করে বাঁচাচ্ছে প্যাঁচা! আমিও ফাঁক পেলে ওদের গোলে হানা দিচ্ছি··· কিন্তু বিল্‌টে ঘোষটা যেন পাঁচিল হয়ে গোল আটকাচ্ছে।

আমি শুধু ভাবছি···ভেট্‌কী গেল কোথায়?

অনেক দূর থেকে একটা বল গড়াতে গড়াতে আমাদের গোলের দিকে চলেছিলো। একটা কড়ে আঙুল আল্‌তো করে ছুঁইয়েও তাকে ঠেকানো যায়। কিন্তু এ কী ব্যাপার! হঠাৎ প্যাঁচা হালদার দারুণ চীৎকার ছেড়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো– প্রাণপণে পা চুলকোতে লাগলো, আর সেই ফাঁকে—

সোজা গোল!

শুধু প্যাঁচা হালদার? ফুল ব্যাক্ কুচো মিত্তির লাফাতে লাফাতে সেই যে বেরিয়ে গেল, আর ফিরলোই না। প্যাঁচা সমানে পা,

চুলকোতে লাগলো, আর পর পর আরো চারটে গোল। মানে ফাঁকা মাঠেই গোল দিয়ে দিলে বলা যায়।

হয়েছিলো কি জানিস? ভেটকীকে বলেছিলুম, গাছ থেকে একটা লাল পিঁপড়ের বাসা ছিঁড়ে এনে উড়ো পাতার সঙ্গে ওদের গোলের দিকে ছেড়ে দিতে, তাহলেই বিলটে ঘোষ একেবারে ঠাণ্ডা। ভেটকী দৌড়ে গেছে, বাসাও এনেছে—কিন্তু ওটা এমন বেল্লিক যে, হাফ টাইমে যে সাইড বদল করতে হয় সে আর খেয়ালই করে নি। একেবারে প্যাঁচা হালদারের গাঁয়েই ছেড়ে দিয়েছে। যখন টের পেয়েছে, তখন আর—

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেনিদা থামলো।

—কিন্তু কচুবনেশ্বরের টিকটিকির ল্যাজ?—আমি আবার কৌতূহল প্রকাশ করলুম।

—আরে, আসল দুঃখু তো সেখানেই। চিংড়িহাটা যখন কাপ নিয়ে চলে গেল, তখন পরিষ্কার দেখলুম ওদের ক্যাপ্টেন বিলটে ঘোষের কালো প্যান্টে একটা নীল তাপ্পিমারা।

—তাতে কী হলো?—ক্যাবলা জিজ্ঞেস করলে।

—তাইতেই সব। নইলে কী ভেটকীটা এমন ভুল করে, বিলটের বদলে প্যাঁচার গায়ে পিঁপড়ে বাসা ছেড়ে দেয়। সবই সেই বাবা কচুবনেশ্বরের লীলা।

—কিছুতেই বুঝতে পারলুম না—হাঁ করে চেয়ে রইলুম টেনিদার মুখের দিকে।

আর টেনিদা খপ্ করে আমার মুখটা চেপে বন্ধ করে দিয়ে বললে, আরে, বাবার থান থেকে বেরিয়েই দেখি সামনে নদীর ধারে দড়ি টাঙিয়ে ধোপারা জামা-কাপড় শুকোতে দিয়েছে। হাতে টিকটিকির ল্যাজটা তখনও ছিলো—কী ভেবে আমি গ্রেটাকে একটা কালো প্যান্টের পকেটে গুঁজে দিয়েছিলুম আর সেই প্যান্টটায় নীল রঙের একটা তাপ্পিমারা ছিলো।

—আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো টেনিদা। আর মাথার ওপরে টিকটিকিটা ডেকে উঠলো: টিকিস-টিকিস ঠিক ঠিক।

বেয়ারিং ছাঁট

পাঁচ

পটলডাঙার টেনিদা, আমি আর হাবুল সেন চাটুজ্জেদের রকে বসে মন দিয়ে পেয়ারা খাচ্ছি। হঠাৎ দেখি, ক্যাবলা বেশ কায়দা করে—নাকটাকে উচ্চিংড়ের মতো আকাশে তুলে সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। কেমন একটা আলেকজাণ্ডারের মতো ভঙ্গি—যেন দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছে।

টেনিদা খপ্ করে একটা লম্বা হাত বাড়িয়ে ক্যাবলাকে ধরে ফেললো।

—বলি, অমন তালেবরের মতো যাওয়া হচ্ছে কোথায়? নাকের ডগায় একটা চশমা চড়িয়েছিস বলে বুঝি আমাদের দেখতেই পাসনি।

ক্যাবলা বললে, দেখতে পাবো না কেন? একটু কাজে যাচ্ছি—

—এই রোববার সকালে কী এমন রাজকার্যে যাচ্ছিস র‍্যা? নেমন্তন্ন খেতে নাকি? তাহলে আমরাও সঙ্গে যাই।

ক্যাবলা গম্ভীর হয়ে বললে, না—নেমন্তন্ন না। আমি চুল ছাঁটতে যাচ্ছি।

—চুল ছাঁটতে? টেনিদা শুনে দারুণ খুশি হলো: ডি-লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস্! চল—আমিও যাচ্ছি।

এইবার আমার পালা। আমি চেঁচিয়ে বললুম, খবরদার ক্যাবলা টেনিদাকে সঙ্গে নিয়েছিস কি মরেছিস! গতবছর টেনিদা আমাকে এমন একখানা 'গ্রেট-ছাঁটাই' লাগিয়েছিলো যে, আমার বৌভাতের নেমতন্ন খাওয়া একদম বরবাদ।

টেনিদা চটে বললে, তুই একটা পয়লা নম্বরের পেঁয়াজ-চচ্চড়ি। বেশ ডিরেকশন দিয়ে দিয়ে চুল ছাঁটাচ্ছিলুম—চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ভণ্ডুল

করে দিলি। না রে ক্যাবলা, তোর কোনো ভয় নেই। আমি অ্যায়সা কায়দা করে তোর চুল ছাঁটিয়ে আনবো যে, কী বলে—তোর মাথা দিয়ে কী বলে—একেবারে শিখা বেরুতে থাকবে।

হাবুল বললে, হ, শিখাই বাইর হইবো। শিখার মানে হইলো গিয়া টিকি।

আমি বললুম, তা বেশ তো—তুই টিকিই রাখ ক্যাবলা। আমরা সবাই বেশ করে টানতে পারবো?

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, টেক কেয়ার! টিকি নিয়ে টিক-টিকির মতো টিক টিক করবিনে—বলে দিচ্ছি? শিখা মানে বুঝি আর কিছু হয় না? তা হলে আলোর শিখা মানে কী? আলোর টিকি? আলোর কখনো টিকি হয়? কোন্‌দিন বলবি, অন্ধকারের টিকি—চাঁদের টিকি—

হাবুল খুব জ্ঞানীর মতো বললে, চাঁদের টিক ধইরা রাশিয়ানরা তো টান মারছে!

আমি বাধা দিয়ে বললুম, কক্ষণো না। চাঁদের মাথা ন্যাড়া—আমাদের পাড়ার নকুলবাবুর মতো। চাঁদের টিকি নেই।

ক্যাবলা বললে, উঃ—এরা তো মাথা ধরিয়ে দিলে দেখছি। ঘাট হয়েছে, আমি আর চুল ছাঁটতে চাই না। এই বসছি।

টেনিদা হতাশ হয়ে বললো, বসলি?

—হ্যাঁ, বসলুম।

—আমাকে নিয়ে চুল ছাঁটতে যাবিনে?

—না।—ক্যাবলার মুখে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা দেখা দেখা দিলে: তোমাকে নিয়ে তো নয়ই। প্যালার সেই গ্রেট ছাঁটাই আমি দেখেছি, ও যে গল্পটা লিখেছিলো মনের দুঃখে, সেটাও পড়েছি।

টেনিদা মন খারাপ করে বললে, তোর ভালোর জন্যেই বলেছিলুম।

মানে আমার ভুলোদার মতো সস্তায় কিস্তিমাৎ করতে গিয়ে না পস্তাস, সেইজন্যেই বলছিলুম।

আমি বললুম, ব্যাপারটা খুলে বলো তা হলে। কী হয়েছিলো তোমার ভুলোদার ?

—কী হয়েছিলো ভুলোদার ? টেনিদা টকাং করে আমার চাঁদিতে ছোট্ট একটা গাঁট্টা মারলে ঃ ফাঁকি দিয়ে গপ্পোটা বাগাবার চেষ্টা আর সেইটে পত্রিকায় লিখে দেবার মতলব ? ও-সব চালাকি চলবে না। ভুলোদার সেই প্যাথেটিক কাহিনী শুনতে হলে চার আনার তেলেভাজা আগে আন—কুইক।

আমার পকেটে দু'আনা ছিলো, আরও দু'আনা হাবুলের কাছ থেকে আমায় ধার করতে হলো।

দু'খানা বেগুনী একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে টেনিদা বললে, আমার ভুলোদা—মানে আমাদের দূর-সম্পর্কের জ্যাঠামশাইয়ের এক ছেলে —পয়সা-কড়ির ব্যাপারে ছিলো বেজায় টাইট। জ্যাঠামশাইয়ের টাকার অভাব ছিলো না, ভুলোদাও কী সব ধান-পাটের ব্যবসা করত—কিন্তু একটা পয়সা খরচ করতে হলে ভুলোদার চোখ কপালে উঠে যেত।

বললে বিশ্বাস করবি নে, একদিন বাজারে গিয়ে টুক করে একটা নয়া পয়সা পড়ে গেল নালার ভেতরে। বাজারের নালা—বুঝতেই পারছিস। যেমন নোংরা—তেমনি বদ্‌খৎ গন্ধ—তার ওপরে এক হাত পাঁক। দেখলেই নাড়ী উলটে আসে। কিন্তু ভুলোদা ছাড়বার পাত্তর নয়। এক ঘণ্টা ধরে দু'হাতে সেই নালা ঘাঁটলে। আর একটার বদলে চার-চারটে নয়া পয়সা মিললো তার ভেতর থেকে, একটা অচল সিকি পেলে, দুটো মরা সিঙ্গি মাছ আর জ্যান্ত একটা

খলসে মাছও পেয়ে গেল! তিনটে নয়া পয়সা নগদ লাভ হলো, সেদিন আর মাছও কিনতে হলো না।

হাবুল বললে, এ রাম ?—থু—থু—

টেনিদা বললে, থু—থু ? জানিস, ভুলোদা এখন কত বড়োলোক ? বাড়িতে গামছা পরে বসে থাকে, কিন্তু ব্যাঙ্কে তার কত টাকা!

ক্যাবলা বললে, আমাদের বড়লোক হয়ে কাজ নেই, বেশ আছি। পচা ড্রেন থেকে মরা সিঙ্গি মাছ খেতে পারবো না—গামছা পরেও বসে থাকতে পারবো না।

টেনিদা বললে, না পারবি তো যা—কচুপোড়া খেগে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, আঃ—ঝগড়া করছো কেন ? গল্পটা বলতে দাও না।

টেনিদা গজ-গজ করতে লাগলো : হুঃ- বড়োলোক হবেন না। না হলি তো না হলি—অত তড়পানি কিসের জন্যে র‍্যা ? মরা সিঙ্গি মাছ খেতে না চাস, জ্যান্ত তিমি মাছ খা—গামছা পরতে না চাস আলোয়ান পরে বসে থাক। ওসব ধ্যাষ্টামো আমার ভালো লাগে না—হুঁঃ।

আমি বললুম, গপ্পোটা—

—গপ্পোটা!—টেনিদা মুখটাকে ডিম-ভাজার মতো করে বললে, ধ্যুৎ! খালি কুরুবকের মতো বকবক করলে গপ্পো হয় ?

ক্যাবলা বললে, কুরুবক এক রকমের ফুল। ফুল কখনো বকবক করে না।

টেনিদা চেঁচিয়ে বললে, শাট আপ ? আমি বলছি কুরুবক এক রকমের বক—খুব বিচ্ছিরি বক। ফের যদি আমার সঙ্গে তক্কো করবি, তা হলে আমি এক্ষুণি কাঁচি এনে তোকে একটা গ্রেট ছাঁটাই লাগিয়ে দেবো।

শুনে ক্যাবলার মুখ-টুখ একেবারে শুঁটকি মাছের মতো হয়ে গেল। বললে, না-না, তুমি বলে যাও। আমি আর তক্কো করবো না।

—করিসনি। বেঘোরে মারা যাবি তা হলে। বলে—কুরুবক এক রকমের ফুল। তা হলে গরুও একরকমের ফল, রসগোল্লা এক রকমের পাখি, বানরগুলোও এক রকমের পাকা তাল। যা—যা—চালাকি করিসনি।

আমি বললুম, কিন্তু ভুলোদা—

—আরে গেল যা! এটা যে ভুলোদা ভুলোদা করে ক্ষেপে যাবে দেখছি।—টেনিদা আমার চাঁদিতে আর একটা গাঁট্টা মারলে: সিঙ্গি মাছ দিয়ে নিজেও পটলের ঝোল খায় কিনা—তাই এত ফুরত্তি হয়েছে।—বলে তেলেভাজার ঠোঙা থেকে শেষ আলুর-চপটা মুখে পুরে দিয়ে বললে, একদম সাইলেন্স! নইলে গল্প আমি আর বলবো না।

আমরা বললুম, আচ্ছা—আচ্ছা!

টেনিদা শুরু করলো:

ভুলোদা পশ্চিমে কোথায় ব্যবসা করতো। ওদেশে থাকবার জন্যে—আর পয়সা বাঁচাবার জন্যে তো বটেই, একেবারে পুরোপুরি দেশোয়ালী বনে গিয়েছিলো। মোটা কুর্তা পরতো, পায়ে দিতো কাঁচা চামড়ার নাগরা—গড়গড়িয়ে দেহাতী তালুতে সব সময় খৈনি ডলতো। পানকে বলতো 'পানোয়া'—সাপকে বলতো 'সাঁপোয়া'। আমরা কিছু জিজ্ঞেস করলে অন্যমনস্কভাবে জবাব দিতো 'কুছ, কহলি তো?'

কামাতে খরচ হবে বলে দাড়ি রেখেছিলো। তাতে বেশ সাধু-সাধু দেখাত আর গাঁয়ের সাদাসিধে মানুষ কিছু ভক্তি-ছেদ্দাও করত। কিন্তু চুলটা মাঝে মাঝে না কাটলে মাথা কুট-কুট করে। তা ছাড়া কী বলে—রাত-দিন টাকার ধান্দায় ঘুরে ভুলোদা খুব সাফসুফ থাকতেও পারে না। জামা কাচে মাসে একবার, চান করে বছরে

চারবার। তাই চুল একটু বেশি বড়ো হলেই উকুন এসে বাসা বাঁধে। কিন্তু চুল ছাঁটাইয়েও ভুলোদার খরচা ছিল না। বেশ একটা কায়দা করে নিয়েছিলো। কী কায়দা বল দিকি ?

আমি বললুম, বোধহয় নিজেই কাঁচি দিয়ে ছাঁটাই করত।

টেনিদা সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল'র কাকটার মতো দুলে দুলে বললে, হয় নি – হয় নি—ফেল।

হাবুল বললে, হ, বুঝছি। নিজের মাথার চুল খাম্‌চা খাম্‌চা কইরা টাইনা তুলত।

—ইঃ—কী বুদ্ধি। মগজ তো নয়—যেন নিরেট একটি খাজা কাঁঠাল বসে আছে। আয় ইদিক– খিম্‌চে খিম্‌চে তোর খানিক চুল তুলে দি। কেমন লাগে, টের পাবি।

টেনিদা হাত বাড়াতেই হাবুল সড়াৎ করে এক লাফে রক থেকে নেমে পড়লো।

ক্যাবলা বললে, আমরা ও-সব কায়দা-ফায়দার খবর জানবো কোত্থেকে। তুমিই বলো।

টেনিদা তেলেভাজার ফাঁকা ঠোঙাটা খুঁজে একটা কিসের ভাঙা টুকরো পেলে। অগত্যা সেইটেই মুখে পুরে দিয়ে বললে, কায়দাটা বেশ মজার। ভুলোদা নজর করে দেখেছিলো, দেহাতী নাপিতদের মধ্যে বেশ সুন্দর একটা নিয়ম আছে। চুল-দাড়ি ছাঁটতে স্বজাতির কাছ থেকে ওরা কখনো পয়সা নেয় না। গিয়ে নমস্কার করে সামনে বসলেই বুঝে নেবে—এ আমার সমাজের লোক। তখন দিব্যি একখানা ফ্রী হেয়ার কাট্। আসবার সময় আর একটা নমস্কার করে উঠে এলেই হলো—একটা পয়সা খরচ নেই।

ভুলোদাও শিখে নিয়েছিলো। ব্যবসার কাজে, গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতে—আসতে যেতে দুটি নমস্কার ঠুকলেই—ব্যস, কাজ হাসিল।

সেদিনও তাই করছে। 'রাম রাম ভেইয়া' বলে তো বসে পড়েছে

এক নাপিতের সামনে, চুল ছাঁটাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেহাতী ভাষায় নানান গপ্পো চলছে। চাষের অবস্থা কেমন, কোথায় 'ভাণ্ডা কে ভর্তা' মানে বেগুনের ঘণ্ট—দিয়ে আচ্ছা পুরী খাওয়া যায়, কোন্ গাছে 'তিনোয়া চূড়ৈল'—মানে তিনটে পেত্নী 'রহতী বা'। এই সব সদালাপের ভেতর দিয়ে ভুলোদার চুল কাটা শেষ হলো।

'চলে ভেইয়া—রাম রাম—' বলে ভুলোদা পা বাড়াতে যাবে, তক্ষুণি একটা কাণ্ড হলো।

সামনেই গঙ্গা। একটা খেয়া নৌকো ওপার থেকে এপারে লাগলো। আর দেখা গেল সেই নৌকো থেকে নেমে জনা পনেরো লোক এদিক পানেই আসছে। বুড়ো থেকে ছোকরা পর্যন্ত সব বয়সের লোক আছে তাদের ভেতর।

দেখেই নাপিতের চোখ কপালে উঠলো। 'হায় রাম' বলে খাবি খেলো একটা। ভুলোদা গুটি গুটি চলে যাচ্ছিলো, হঠাৎ নাপিত খপ্ করে হাত চেপে ধরলে তার।

—এই, ভাগতা কেঁও? বৈঠো!

ভুলোদা অবাক! পয়সা চায় নাকি? দেহাতী ভাষায় বললে, আমি পয়সা দেবো কেন? আমি তো তোমার স্বজাত!

নাপিত বললে, সে বলতে হবে না—আমি জানি। ওই যে পনেরোজন লোক আসছে, দেখছো না? ওদের কামাতে হবে এখন। আমি একা পারবো কেন? তুমিও আমাদের স্বজাত—হাত লাগাও।

—অ্যাঁ!

নাপিত টেনে ভুলোদাকে পাশে বসিয়ে দিলে। বললে, কী করবে ভেইয়া—দেশ গাঁয়ের নিয়ম তো মানতে হয়। ওরাও আমাদের জাত-কুটুম। গাঁয়ে লোক মরেছে—তাই সবাই কামাতে আসছে এপারে।

নাপিত একটা খাবি খেয়েছিলো, ভুলোদা চারটে বিষম খেলো।

তা-তা—ওরা এপারে কেন ? ওপারে কামালেই তো পারতো।

নাপিত রেগে বললে, বুদ্ধু ! স্বজাত হয়েও যেন কিছু জানো না ! কামাবে কে—সবারই তো অশৌচ।

ভুলোদা ততক্ষণে হাঁ করে বসে পড়েছে। মুখের ভেতর টপাৎ করে একটা পাকা বটের ফল পড়লো, টেরও পেল না। ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে। আর বুঝেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তার।

বুঝলি। আরো সব মজার নিয়ম রয়েছে ওদের দেশে। গাঁয়ে কেউ মরলেই সমস্ত পুরুষ মানুষকে মাথা কামাতে হবে—দাড়ি চাঁছতে হবে। তাই সব সুদ্ধু এপারে এসে পৌঁছেছে।

ভুলোদা তবু একবার শেষ চেষ্টা করলে। আমার বহুৎ কাজ আছে—পেটমে দরদ হচ্ছে—

এর মধ্যে পনেরোজন লোক এসে পড়েছে। নাপিত ধমক দিয়ে বললে, আভি চুপ করো—ক্ষুর লে লেও।—বলেই ভুলোদার হাতে ক্ষুর ধরিয়ে দিলে একখানা।

পনেরোজন এসে তো 'রাম রাম' বলে নমস্কার করে গোল হয়ে বসে পড়লো। ভুলোদার তখন মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে—হাত-পা একেবারে হিম। ম্যালেরিয়ায় ভোগা রোগা পটকা লোক তো নয়—ইয়া ইয়া সব জোয়ান। সঙ্গে পাকা পাকা বাঁশের লাঠি। এমন করে ঘিরে বসেছে যে, পালানোর রাস্তাঘাট সব বন্ধ।

পয়সা দিয়ে দাড়ি কামাবার ভয়ে কোনো দিন ক্ষুর ধরেনি—চুল-ছাঁটা তো বেয়ারিং পোস্টেই চালিয়েছে এতকাল। মাথা-মুখ কামাবে কি—কিছুই জানে না। কিন্তু সে কথা বলবারও জো নেই। এক্ষুণি দিব্যি বিনি-পয়সায় চুল কেটে নিয়েছে। যদি বলতে যায়, আমি তোমাদের সমাজের লোক নই—তা হলে কেবল নাপিতই নয়, সবসুদ্ধ ষোলজন লোক তাকে অ্যায়সা ঠ্যাঙানি দেবে যে, ভুলোদা

কেবল তক্তা নয়—একেবারে তক্তাপোশ হয়ে যাবে। চেয়ার টেবিল হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

নাপিত ততক্ষণে একজনের মাথা জলে ভিজিয়েছে একটুখানি, তারপর ঘচাঘচ ক্ষুর চালাতে শুরু করেছে। আর একজন দিব্যি উবু হয়ে ভুলোদার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিয়ে ঘুঘুর মতো বসে আছে।

ওদিকে ভুলোদা চোখ বুজে বলছে: হে মা-কালী, এ যাত্রা আমায় বাঁচাও। তোমায় আমি সোয়া পাঁচ আনার—না - না—বড্ড বেশি হয়ে গেল—সোয়া পাঁচ পয়সার পুজো দেবো!

হাবুল চুক চুক করে বললে, ইস্—ইস্! আইচ্ছা ফ্যাচাঙে তো পইড়্যা গেছে তোমার ভুলোদা!

আমি বললুম, কিন্তু কী কিপ্‌টে দেখেছিস! তখনো পয়সার দিকে নজরটা ঠিক আছে।

টেনিদা বললে, তা আছে! ওই জন্যেই তো মা-কালী ওকে দয়া করলেন না। সাদাসিধে মানুষগুলোর হকের পয়সা এইভাবে ঠকানো! এখন বোঝ মজাটা।

ভুলোদা তো সমানে জপ করছে: মা—মা—সোয়া পাঁচ আনা—না—না—সোয়া পাঁচ পয়সার পুজো দেবো—আর এদিকে যে লোকটা মাথা পেতে ঠায় বসেই ছিলো, তার ঘাড়ে ব্যাথা হয়ে গেছে। সে রেগে ভুলোদার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বললে, আরে হাঁ করকে কাহে বৈঠা হায়? হাত লাগাও—

ভুলোদা দেখলো, আর উপায় নেই। তক্ষুনি লোকটার মাথায় ক্ষুর বসিয়ে দে এক টান!

জল-টল কিছু দেয়নি—চুল ভেজেনি—ওভাবে ক্ষুর লাগালে কী হয়, বুঝতেই পারিস!

'আরে হাঁ—হাঁ—ক্যা করতা—বলে লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো, আর ভুলোদা—গিঁ—গিঁ—গিঁ—বলে আওয়াজ তুলেই ঠায় অজ্ঞান!

সত্যি সত্যিই অজ্ঞান? আরে, না—না! প্রাণটা তো বাঁচাতে হবে। তাই অজ্ঞান হওয়া ছাড়া ভুলোদা আর কোনো রাস্তা খুঁজে পেলে না।

তখন চারিদিকে ভারী গোলমাল শুরু হলো।

—আরে, ক্যা ভৈল? ক্যা ভৈল? মর গেইল বা?—ক্ষুরের ঘায়ে যে লোকটার চাঁদি ছুলে দিয়েছে—সে পর্যন্ত তার পেল্লায় চাঁটিটা সামলে নিলে।

—এ জী, তুমরা ক্যা ভৈল? মানে—ওহে, তোমার কী হলো?

ভুলোদা বলে চললো: গিঁ—গিঁ—গিঁ—

তখন একজন বললে, ভূত পাকড়লি, কা?—মানে ভূতে ধরলো!

সকলে একবাক্যে বললে, তাই হবে।

ব্যস—আর কথা নেই। ষোলজন লোক তক্ষুণি ভুলোদাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চললো যেভাবে শূয়োর নিয়ে যায় আর কি! ভুলোদার হাত-পা যেন ছিঁড়ে যেতে লাগলো—একটুখানি নধর ভুঁড়ি হয়েছিলো, সেটা নাচতে লাগলো ফুটবলের মতো। কিন্তু ষোলজনের কাছ থেকে বাঁচতে হলে চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। তখন গলা দিয়ে গিঁ গিঁ—নয়—সত্যিকারের গোঁ গোঁ বেরুচ্ছে!

নিয়ে ফেললে এক রোজার বাড়ীতে। সবাই মিলে চেঁচিয়ে বললে, ভূত পাকড়লি!

রোজা বললে, ঠিক হ্যায়—আচ্ছাসে পাকড়ো।

অমনি সবাই মিলে ভুলোদার হাত-পা ঠেসে ধরলে। ভুলোদা তেমনি গোঁ-গোঁ করতে লাগলো।

এদিকে রোজা কতকগুলো শুকনো লঙ্কার মতো কী পুড়িয়ে ভুলোদার নাকে ধোঁয়া দিতে শুরু করলে। ফ্যাঁচচো ফ্যাঁচচো করে হাঁচতে-হাঁচতে ভুলোদার তো নাড়ী ছিঁড়ে যাবার দাখিল।

তারপরেই রোজা করেছে কি—কোত্থেকে একটা খ্যাংরা ঝাঁটা

এনে—কী সব বিড়-বিড় করে বকতে-বকতে ভুলোদাকে ঝপাং ঝপাং করে পিটতে আরম্ভ করেছে।

ভুলোদার অবস্থা তখন বুঝতেই পারছিস! গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলো : বাবা-রে—মা-রে—ঠন্‌ঠনের কালী-রে—আমার দফা সারলে রে—আমি গেলুম রে!

নাপিতরা চোখ বড়ো করে বললে, বাংলা বোল রহা।

তখন সবাই বললে, আঁ—বাঙালী ভূত পকড়লি! রাম—রাম—রাম—।

রোজা মাথা নাড়লে। বললে, বাঙালীর ভূত বহুৎ জব্বর ভূত। আরো জোরে ঝাঁটা চালাতে হবে।

ঝপাং—ঝপাং—ঝপাং—। তার ওপরে নাকে সেই লঙ্কা-পোড়ার গন্ধ! ভুলোদা আর কিছু টের পেলে না।

উঠে বসলো তিনঘণ্টা পরে। একটু একটু করে ব্যাপারটা খেয়াল হচ্ছে তখন। দেখলে, দু'শো গাঁয়ের লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। তার মাথা পরিষ্কার করে কামানো—একেবারে ন্যাড়া—মুখে একটি দাড়ির চিহ্ন নেই, এমন কি ভুরু পর্যন্ত নিটোলভাবে চাঁছা। চাঁদির ওপরে দুর্গন্ধ কী একটা প্রলেপ মাখানো—গা ভর্তি জল আর কাদা।

হেসে রোজা বললে, হাঁ, আব ঠিক হোই। ভূত ভাগ গইল বা।

হাঁ—সেই থেকে ভূত সত্যিই পালিয়েছে ভুলোদার। এখন আর সস্তায় কিস্তিমাৎ করতে চায় না। নিয়মিত সেলুনে গিয়ে—নগদ আটগণ্ডা পয়সা খরচ করে চুল ছেঁটে আসে।

তাই বলছিলুম, ওরে ক্যাবলা—

রেগে ক্যাবলা উঠে দাঁড়ালো : আমি তোমার ভুলোদার মতো বিনি পয়সায় চুল ছাঁটতে চাইছিলুম—একথা তোমায় কে বললে?

তারপর তেমনি কায়দা করে—নাকের ওপর চশমাটাকে আরো উঁচুতে তুলে, আলেকজাণ্ডারের ভঙ্গিতে গটমটিয়ে চলে গেল।

টেনিদা আর সিন্ধুঘোটক

গড়ের মাঠ। সারাটা দিন দারুণ গরম গেছে, হাড়ে-মাংসে যেন আগুনের আলপিন ফুটছিল। এই সন্ধ্যেবেলায় আমি আর টেনিদা গড়ের মাঠে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। কেল্লার এ-ধারটা বেশ নিরিবিলি, অল্প অল্প আলো-আঁধারি, গঙ্গা থেকে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া।

একটা শুকনো ঘাসের শিস্ চিবুতে চিবুতে টেনিদা বললে, ধ্যেৎ।

—কী হল?

—সব বাজে লাগছে। এমন গরমের ছুটিটা—লোকে আরাম করে সিম্‌লা-শিলং বেড়াতে যাচ্ছে আর আমরা এখানে বসে বসে স্রেফ্ বেগুনপোড়া হচ্ছি। বোগাস্!

—একমণ বরফ কিনে তার ওপর শুয়ে থাকলেই পারো—আমি ওকে উপদেশ দিলুম।

টেনিদা তক্ষুণি হাত বাড়িয়ে বললে, টাকা দে।

—কীসের টাকা?

—বরফ কেনবার।

—আমি টাকা পাব কোথায়?

—টাকা যদি দিতে পারবিনে, তাহলে বুদ্ধি জোগাতে বলেছিল কে র‍্যা?—টেনিদা দাঁত খিঁচালো বিচ্ছিরিভাবে: এদিকে গরমের জ্বালায় আমি ব্যাং-পোড়া হয়ে গেলুম আর উনি বসে বসে ধ্যাষ্টামো করছেন।

—এখন গরম আবার কোথায়—আমি টেনিদাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলুম: কেমন মনোরম রাত, গঙ্গার শীতল বাতাস বইছে—

আরো একটু কবিতা করে বললুম :—'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির—'

—নিশির শিশির।—টেনিদা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল : ছ্যাখ্ প্যালা ফাজলেমিরও লিমিট আছে। এই জষ্টিমাসে শিশির। দেখা দিকিনি, কোথায় তোর শিশির।

ভারী ল্যাঠায় ফেলল তো। এ-রকম কাঠগোঁয়ার বেরসিকের কাছে কবিতা-টবিতা বলতে যাওয়াই বোকামো। আমি অনেকক্ষণ মাথা-টাথা চুলকে শেষে একটা বুদ্ধি করে বললাম, আচ্ছা, কালকে সকালে তোমাকে শিশির দেখাব, মানে সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্ থেকে শিশিরদা-কে ডেকে আনব।

বুদ্ধি করে আগেই সরে গিয়েছিলুম, তাই টেনিদা-র চাঁটিটা আমার কানের পাশ দিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেল। টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, তুই আজকাল ভারী ওস্তাদ হয়ে গেছিস। কিন্তু এই আমি তোকে লাস্ট ওয়ার্ণিং দিলুম। ফের যদি গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি করবি, তাহলে এক ঘুষিতে তোকে—

আমি বললুম, ঘুষুড়িতে উড়িয়ে দেবে।

বদমেজাজী হলে কি হয়, টেনিদা গুণের কদর বোঝে। সঙ্গে সঙ্গে একগাল হেসে ফেলল।

—ঘুষি দিয়ে ঘুষুড়িতে ওড়ানো। এটা তো বেশ নতুন শোনালো। এর আগে তো কখনো বলিসনি।

—আমি চোখ পিট-পিট করে কায়দাসে বললুম, হুঁ—হুঁ—আমি আরো অনেক বলতে পারি। সব একসঙ্গে ফাঁস করি না, স্টকে রেখে দিই।

—আচ্ছা, স্টক থেকে আরো দু-চারটে বের কর দিকি।

আমি বললুম, চাঁটি দিয়ে চাঁটগাঁয় পাঠানো, চিমটি কেটে চিমশেপুরে চালান করা—

—চিমেশপুর ? সে আবার কোথায় ?

—ঠিক বলতে পারব না। তবে আছে কোথাও নিশ্চয়।

—তোর মুণ্ডু।—টেনিদা হঠাৎ ভাবুকের মতো ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। খানিকক্ষণ ড্যাব ড্যাব করে আকাশের তারা-টারা দেখল খুব সম্ভব, তারপর করুণ স্বরে বললে, ডাক—ডাক।

—কাকে ডাকব টেনিদা ? ভগবানকে ?

আঃ, কচুপোড়া খেলে যা। খামোকা ভগবানকে ডাকতে যাবি কেন ? আর তোর ডাক শুনতে তো ভগবানের বয়ে গেছে। ডাক ওই আইসক্রীমওয়ালাকে।

আমার সন্দেহ হ'ল।

—পয়সা কে দেবে ?

—তুই-ই দিবি। একটু আগেই তো একমণ বরফের ফরমাস করছিলি।

বোকামোর দাম দিতে হ'ল। আইসক্রীম শেষ করে, কাঠিটাকে অনেকক্ষণ ধরে চেটেপুটে পরিষ্কার ক'রে টেনিদা ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে যাচ্ছে, হঠাৎ—ফ্যাঁচ্।

আমিই হেঁচে ফেললুম। একটা মশা-টশা কী যেন আমার নাকের ভেতর ঢুকতে যাচ্ছিল।

টেনিদা চটে উঠল : এই হাঁচলি যে ?

—হাঁচি পেল।

—পেল ? আমি শুতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময়েই তুই হাঁচলি ? যদি একটা ভালো-মন্দ হয়ে যায় ? মনে কর এই যদি আমার শেষ শোয়া হয় ? যদি শুয়েই আমি হার্টফেল করি ?

বললুম, অসম্ভব। স্কুল-ফাইনালে তুমি এত বেশি হার্টফেল করেছ যে সব ফেল প্রুফ হয়ে গেছ।

টেনিদা বোধহয় এক চাঁটিতে আমাকে চাটগাঁয়ে পাঠানোর

জন্যেই উঠে বসতে যাচ্ছিল, ঠিক তক্ষুণি ঘটে গেল ব্যাপারটা।

কে যেন মোটা গলায় বললে, ওঠো হে কম্বলরাম—গেট আপ!

আমরা দু-জনেই একসঙ্গে দারুণভাবে চমকে উঠলুম।

দুটো লোক আমাদের দু-পাশে দাঁড়িয়ে। একজন তালগাছের মতো রোগা আর ঢ্যাঙা, এই দারুণ গরমেও তার মাথা-টাথা সব একটা কালো র‍্যাপার দিয়ে জড়ানো। আর একজন ষাঁড়ের মতো জোয়ান, পরনে পেন্টলুন, গায়ে হাতকাটা গেঞ্জী। তারও নাকের ওপর একটা ফুলকাটা রুমাল বাঁধা আছে।

এবার সেই রোগা লোকটা হাঁড়িচাঁচার মতো চ্যাঁ-চ্যাঁ গলায় বললে, আর পালাতে পারবে না কম্বলরাম, তোমার সব ওস্তাদি এবার খতম। ওঠো বলছি—

টেনিদা হাঁক-পাঁক করে উঠে বসেছিল। দাঁত-খিঁচিয়ে বললে, কে মশাইরা এই গরমের ভেতরে এসে খামোকা কম্বল-কম্বল বলে চ্যাঁচাচ্ছেন? এখানে কাঁথা-কম্বল বলে কেউ নেই। আমরা কী বলে—ইয়ে—এই গঙ্গার শীতল সমীর-টমীর সেবন করছি, এখন আমাদের ডিস্‌টার্ব করবেন না।

—ও, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি!—ষণ্ডা লোকটা ফস ক'রে প্যান্টের পকেট থেকে কী একটা বের ক'রে বললে, দেখছ?

দেখেই আমার চোখ চড়াং ক'রে কপালে চড়ে গেল। আমি কাঁউ মাঁউ করে বললুম, পিস্তল!

ঢ্যাঙা লোকটা বললে, আলবৎ পিস্তল! আমার হাতেও একটা রয়েছে। এ দিয়ে কী হয়, জানো? ক্রম্‌ করে আওয়াজ বেরোয়—ধাঁ করে গুলি ছোটে, যার গায়ে লাগে সে দেন অ্যাণ্ড দেয়ার দুনিয়া থেকে কেটে পড়ে।

টেনিদার মতো বেপরোয়া লীডারেরও মুখ-টুখ শুকিয়ে প্রায়

আলু-কাবলীর মতো হয়ে গেছে, খাঁড়ার মতো লম্বা নাকটা ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে। কি কুক্ষণে বেশ কায়দা ক'রে দু-জনে একটা নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়েছিলুম—আশেপাশে লোকজন কোথাও কেউ নেই! চেঁচিয়ে ডাক ছাড়লে দু-পাঁচজন নিশ্চয় শুনতে পাবে, কিন্তু আমরা আর তাদের বিশেষ কিছু শোনাতে পারব না, তার আগেই দু-দুটো পিস্তলের গুলিতে আমাদের দুনিয়া থেকে কেটে পড়তে হবে। একেবারে দেন অ্যাণ্ড দেয়ার।

আমার সেই ছেলেবেলার পিলেটা আবার যেন নতুন করে লাফাতে শুরু করল, কানের ভেতর যেন ঝিঁঝিঁ পোকারা ঝিঁঝিঁ করতে লাগল, নাকের মধ্যে উচ্চিংড়েরা দাঁড়া নেড়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে এমনি মনে হতে লাগল। ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল অজ্ঞান হয়ে যাই, কিন্তু দু-দুটো পিস্তলের ভয়ে কিছুতেই অজ্ঞান হ'তে পারলুম না।

টেনিদা-ই আবার সাহস করে—বেশ চিনি-মাখানো মোলায়েম গলায় তাদের বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলতে লাগল : - দেখুন মশাইরা, আপনারা ভীষণ ভুল করেছেন। এখানে কম্বল বলে কেউ নেই, কম্বল বলে কাউকে আমরা চিনি না, শীতকালে আমরা কম্বল গায়ে দিই না—লেপের তলায় শুয়ে থাকি। এ হ'ল আমার বন্ধু পটলডাঙার প্যালারাম, আর আমি হচ্ছি শ্রীমান টেনি, মানে—

মোটা লোকটা ঘোঁৎ ঘোৎ করে বললে, মানে কম্বলরাম। প্যালারামের বন্ধু কম্বলরাম—রামে রামে মিলে গেছে। যাকে বলে, রামে এক, রামে দো। ঘুঁ—ঘুঁ—ঘুঁৎ—

শেষের বিটকেল আওয়াজটা বের করল নাক দিয়ে। হাসল বলে মনে হল। আর সেই বিচ্ছিরি হাসিটা শুনে অত দুঃখের ভেতরেও আমার পিত্তিশুদ্ধু জ্বালা করে উঠল।

সেই ট্যাঙা লোকটা খ্যাচম্যাচ করে বললে, কী হাসি মস্করা করছ হে অবলাকান্ত। কম করে একটা পুলিস-ফুলিস এসে যাবে,

তা হলেই কেলেঙ্কারী। ওদিকে সিন্ধুঘোটক তখন থেকে খাপ পেতে বসে রয়েছে, কম্বলরামকে নিয়ে তাড়াতাড়ি না ফিরলে আমাদের জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে! চলো—চলো! ওঠো হে কম্বলরাম, আর দেরী নয়। গাড়ি রেডিই আছে।

রেডি রয়েছে তাতে আর সন্দেহ কী! একটু দূরেই দরজাবন্ধ একটা ঘোড়ার গাড়ি ঠায় দাঁড়িয়ে। বুঝতে পারলুম, ওটা কম্বল-রামকেই অভ্যর্থনা করবার জন্যে এসেছে।

টেনিদা বললে, দেখুন—বুঝতে পারছেন—

—আমাদের আর বোঝাতে হবে না, সিন্ধুঘোটককেই সব বুঝিয়ো। নাও—চলো—বলেই ঢ্যাঙা লোকটা পিস্তলের নল টেনিদার পিঠে ঠেকিয়ে দিলে।

আর এ অবস্থায় হাত তুলে নির্বিবাদে সুড়সুড় করে হেঁটে যেতে হয়, গোয়েন্দার গল্পের বইতে এই রকমই লেখা আছে; টেনিদা ঠিক তাই করল। আমি সরে পড়ব ভাবছি—দেখি বেঁটে লোকটার পিস্তলের নল আমাকেও খোঁচা দিচ্ছে।

—বা-রে আমাকে কেন?—আমি ভাঙা গলায় বলতে চেষ্টা করলুম: আমি তো কম্বলরাম নই।

—না, তুমি কম্বলের দোস্ত কাঁথারাম! তোমাকে ছেড়ে দিই, তুমি দৌড়ে পুলিসে খবর দাও—আর ওরা গাড়ি ছুটিয়ে আমাদের ধরে ফেলুক! চালাকি চলবে না, চাঁদ—চলো!

এ অবস্থায় হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত পর্যন্ত চলতে বাধ্য হয়, আমি কোন্ ছার! আমরা চললুম, ঘোড়ার গাড়িতে উঠলুম, গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল, আর গাড়ি গড়গড়িয়ে চলতে শুরু করে দিলে।

হায় গঙ্গার শীতল সমীর! বেশ বুঝতে পারলুম, এই আমাদের বারোটা বেজে গেল!

গাড়িটা বাজে—একদম লক্কড় মার্কা। ছক্কর ছক্কর করে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। কোন চুলোয় যে যাচ্ছে বোঝবারও জো নেই। সেই জাঁদরেল অবলাকান্ত প্রায় আমাকে চেপ্‌টে বসে আছে—ওর নাম যদি অবলাকান্ত হয়, তবে বলেন্দ্রনাথের মানে, স্বয়ং সিন্ধুঘোটকের চেহারা যে কেমন হবে কে জানে। দরজা খোলার জো নেই—এমন কি, কথাটি অবধি কইবার জো নেই। টেনিদা একবার বলতে চেষ্টা করছিল। মশাই, খামোকা ভুল লোককে হয়রান করে—

ঢ্যাঙা লোকটা খ্যাঁ খ্যাঁ করে বললে, চোপ।

—যাকে তাকে কম্বলরাম ঠাউরে—

—যাকে তাকে? এমনি খাঁড়ার মত নাক, এমনি চেহারা—কম্বলরাম ছাড়া আর কারু হয়? কম্বলরামের কোনো যমজ ভাই নেই, তিনকূলে তার কেউ আছে বলেও আমরা শুনিনি। ইয়ার্কী?

—স্যার, দয়া করে যদি পটলডাঙায় একটা খবর নেন—

—শাট আপ ইয়োর পটলডাঙা-আলুডাঙা। আর একটা কথা বলেছ কি, এই পিস্তলের এক গুলিতে—

কাজেই আমরা চুপ করে আছি। যা হওয়ার হয়ে যাক। শুধু থেকে থেকে আমার পেটের ভেতর থেকে কেমন গুর গুর করে একটা কান্না উঠে আসছিল। আর কখনো পটলডাঙায় ফিরে যেতে পারব না, আর কোনোদিন পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল খেতে পাব না। টেনিদা-র সঙ্গে আড্ডা দিয়েই আমার এই সর্বনাশ হয়ে গেল। মেজদা ঠিকই বলে, 'ওই টেনিদার চ্যালা হয়েই প্যালা স্রেফ্ গোল্লায় গেল।'

আমি তখন বিশ্বাস করিনি। ভাবতুম, যে-যাই বলুক, টেনিদা একজন সত্যিকারের গ্রেটম্যান। দু-একটা চাঁটি-টাঁটি লাগায়, জোর

করে খাওয়া-টাওয়াও আদায় করে, কিন্তু আসলে তার মেজাজটা ভীষণ ভালো, বিপদ-টিপদ হলে লীডারের মতো বুক ঠুকে সামনে এগিয়ে যায়। কিন্তু সে যে এত মারাত্মক—কম্বলরাম হলেও হতে পারে, আর কোথাকার এক বিটকেল সিন্ধুঘোটক তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, এ জানলে কে তার ত্রিসীমানায় এগোতো।

ওদিকে হঠাৎ অবলাকান্ত খ্যাঁ-খ্যাঁ করে হেসে উঠল। বললে, ঘেঁটুদা।

ঘেঁটুদা, ওরফে ঢ্যাঙা লোকটা বললে, কী বলছ হে অবলাকান্ত?

—এটা যে কম্বলরাম, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

ঘেঁটুদা বললে, আলবৎ।

অবলাকান্ত বললে, তা না হলে এমন ভোম্বলরাম হয়।

ঘেঁটুদা বললে, নির্ঘাৎ! ভোম্বলরাম বলে ভোম্বলরাম! ওকে কম্বলরামও বলা যেতে পারে।

অবলাকান্ত বললে, ভোম্বলরামও বলা যায়।

বলেই দুজনে চ্যাঁ চ্যাঁ আর খ্যাঁ খ্যাঁ করে হেসে উঠল।

আমরা নিজের জ্বালায় মরছি, কিন্তু ওদের যে কেন এত হাসি পেল, সে আমি বুঝতে পারলুম না। জুলজুল করে আমি একবার টেনিদার দিকে চেয়ে দেখলুম। গাড়ির ভেতর ওকে ভালো দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না, কিন্তু যেটুকু দেখলুম তাতে মনে হল রাগে ওর দাঁত কিড়মিড় করছে। নিতান্তই দু-দুটো পিস্তল না থাকলে এতক্ষণে একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যেত।

গাড়িটা চলছে তো চলছেই! মাঝে মাঝে গাড়োয়ান এক একবার জিভে টাক্‌রায় এক একটা কটকট আওয়াজ করছে, আর শাঁই শাঁই করে চাবুক হাঁকড়াচ্ছে। গাড়িটার থামবার নামই নেই। একসময় মনে হল, পীচের রাস্তা ছেড়ে খোয়াওঠা পথ ধরল আর থেকে থেকে এক একটা বেয়াড়া ঝাঁকুনিতে পিলেশুদ্ধ নড়ে যেতে লাগল।

এতক্ষণ পথের পাশে গাড়ি-টাড়ির আওয়াজ পাচ্ছিলুম, ট্রামের ঘন্টি কানে আসছিল, লোকের গলা পাওয়া যাচ্ছিল, কানে আসছিল রেডিয়ে-টেডিয়োর শব্দ। এখন মনে হল; হঠাৎ যেন নিঝুম মেরে গেছে, কোথায় যেন, ঝিঁঝি-টিঝিঁ ডাকছে, থেকে থেকে পেঁকো গন্ধ বন্ধ গাড়ির ভেতরেও এসে ঢুকছে। তার মানে উদ্ধারের শেষ আশাটুকুও গেল। এখন আমরা চলেছি একেবারে সিন্ধুঘোটকের খপ্পরে—কোন্ পোড়োবাড়ীর পাতালে নিয়ে আমাদের হুম করে গুম করে ফেলবে—কে জানে!

হঠাৎ ক্যাবলার কথা মনে পড়ে আমার ভারী রাগ হতে লাগল। ক্যাবলা বলে 'ওসব গোয়েন্দা গল্প স্রেফ গাঁজা—বানিয়ে বানিয়ে লেখে, আমি এক বর্ণও বিশ্বাস করি না!' কিন্তু আজ রাতে সিন্ধু-ঘোটকের পাল্লায়—

খ্যাড়—খ্যাড়—খ্যাড়াৎ।

গাড়িটা কাত হয়ে উলটে পড়তে পড়তে সামলে নিলে, মনে হল, কোনো নালা-ফালায় নেমে যাচ্ছিল। আমি একেবারে অবলাকান্তের ঘাড়ে গিয়ে পড়লুম—সে বললে, উহু-উহু, নাকটা গেল মশাই। ওদিকে ঘেঁটুদার গলা থেকে আওয়াজ বেরুল: ক্যাঁক্—গেলুম!

আর তক্ষুনি টেনিদা বললে, ঘেঁটুচন্দর—এবার? তোমার পিস্তল তো কেড়ে নিয়েছি—আগে তোমায় নিকেশ করে ছাড়ব।

আমি চমকে উঠলুম। অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু বুঝতে পারলুম, গাড়িটা কাত হওয়ার ঝাঁকুনিতে টেনিদা সুযোগ পেয়ে ফস করে ঘেঁটুর পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়েছে! একেই বলে লীডার। কিন্তু অবলাকান্তের হাতে তো পিস্তলটা এখনো রয়েছে। টেনিদা না হয় ঘেঁটুকে ম্যানেজ করল, কিন্তু অবলাকান্ত যে এক্ষুনি আমায় সাবাড় করে দেবে।

টেনিদা বললে, ওয়ান-টু-থ্রী। শিগগীর গাড়ির দরজা খোলো, নইলে—

আমি তো কাঠ হয়ে বসে আছি—খালি মনে হচ্ছে, এখুনি আমি গেলুম! এইবারে দু দুটো পিস্তলের আওয়াজ—ঘেঁটুচন্দর চিৎ, আমারও বাতচিৎ চিরতরে ফিনিস। তারপর রইল টেনিদা আর অবলাকান্ত—কিন্তু মহাযুদ্ধের সেই শেষ অংশটা আমি আর দেখতে পাব না কারণ আমি ততক্ষণে দুনিয়া থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছি।

গোয়েন্দা উপন্যাসে এ-সব জায়গায় একটা দারুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। পড়তে পড়তে লোকের মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়। অথচ ঘেঁটু আর অবলাকান্ত হঠাৎ চ্যাঁ চ্যাঁ, খ্যাঁ খ্যাঁ করে অট্টহাসি হাসল।

টেনিদা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই অবলাকান্ত বললে, সাবাস কম্বলরাম, তুমি বীর বটে। তোমার বীরত্ব দেখে আমার চন্দ্রগুপ্ত নাটকের পার্ট বলতে ইচ্ছে করছে আলেকজাণ্ডারের মতো —'যাও বীর, মুক্ত তুমি।' কিন্তু সে আর হওয়ার জো নেই, কারণ আমরা সিন্ধুঘোটকের আস্তানায় ঢুকে পড়েছি।

আর তক্ষুনি খপ করে গাড়িটা থেমে গেল। কোচোয়ান ঘড় ঘড় করে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বললে, নামো।

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল: সাবধান, আমি এখুনি গুলি ছুঁড়ব বলে দিচ্ছি—আমার হাতে পিস্তল—

বলতে বলতে গাড়ির ওধারটা খুলে অবলাকান্ত টপ করে নেমে গেল। আর ঘেঁটুদা বললে, থাম্ ছোক্রা, বেশি বকিস্ নি। পিস্তল ফিস্তল ছুঁড়ে আর দরকার নেই, নেবে আয়—

আর এদিক থেকে অবলাকান্ত এক হ্যাঁচকায় আমাকে নামিয়ে ফেলল, ওদিক থেকে টেনিদা আর ঘেঁটুদা জড়াজড়ি করতে করতে একসঙ্গে কুমড়োর মতো গড়িয়ে পড়ল গাড়ি থেকে।

আমি দেখলুম, সামনে একটা ভুতুড়ে চেহারার পোড়োমতো পুরনো

বাড়ি। তার ভাঙা সিঁড়ির সামনে গাড়ি এসে থেমেছে, চারজন লোক ছুটো লণ্ঠন হাতে করে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

একজন হেঁড়ে গলায় বললে, কী ব্যাপার—কুস্তি লড়ছে কে?

টেনিদা ততক্ষণে ধাঁ-করে একটা ল্যাং কষিয়ে ঘেঁটুকে উল্টে ফেলে দিয়েছিল। ঘেঁটু গ্যাঙাতে গ্যাঙাতে উঠে দাঁড়ালো। বললে, তোমরা তো বেশ লোক, হে! দিব্যি বুঝিয়ে দিলে, কম্বলরামটা এক নম্বরের ভীতু, একটু ভয় দেখালেই ভির্মি খেয়ে পড়বে। এ তো দেখছি সমানে লড়ে যাচ্ছে, আবার একটা প্যাঁচ কষিয়ে আমায় চিৎ করে ফেললে। ইঃ—একগাদা গোবর-টোবর কীসের মধ্যে ফেলে দিয়েছে হে—কী গন্ধ। ওয়াক।

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল : হুঁশিয়ার, আমার হাতে তৈরী পিস্তল।

লোক চারটে থমকে দাঁড়িয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। শেষে একজন বললে, পিস্তল। পিস্তল আবার কোত্থেকে এল হে।

অবলাকান্ত বললে, ছুত্তোর পিস্তল। সেই যে কম্বলরামকে ভয় দেখাব বলে ফিরিওলার কাছ থেকে আড়াই টাকা দিয়ে ছুটো কিনেছিলুম, তারই একটা কেড়ে নিয়েছে আর তখন থেকে শাসাচ্ছে আমাদের।—বলেই আমার হাতে নিজের পিস্তলটা জোর করে গুঁজে দিয়ে বললে, ওহে কম্বলরামের দোস্ত কাঁথারাম, তোমারও গুলি ছোঁড়বার সাধ হয়েছে নাকি। তাহলে এটা তোমায় প্রেজেণ্ট করলুম, চার আনার ক্যাপ্ কিনে নিয়ো—আর সারাদিন ছুম-ফটাস্ করে বাড়ির কাকটাক তাড়িয়ো।

বলে, অবলাকান্ত তো ঘ্যা ঘ্যা করে হাসলই, সেই সঙ্গে গোবরমাখা ঘেঁটুচন্দর, গাড়ির কোচোয়ান আর ছুটো লণ্ঠন হাতে চারটে লোক—সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। আর সেই হাসির আওয়াজে পাশের একটা ঝুপসী মতন আমগাছ থেকে গোটা ছু'তিন বাছুড় ঝট্‌পট্ করে উড়ে পালালো।

ঘেঁটু বললে, কই হে কম্বলরাম, গুলি ছুঁড়লে না?

টেনিদা কিছুক্ষণ ঘুগ্‌নিদানার মতো মুখ করে চেয়ে রইল, তারপর খেলনা পিস্তলটা তার হাত থেকে টপ করে পড়ে গেল। ইস—ইস—আমরা কী গাড়োল। দুটো লোক আমাদের স্রেফ বোকা বানিয়ে গড়ের মাঠ থেকে ভর সন্ধ্যেবেলায় এমন করে ধরে আনল। আগে জানলে—

কিন্তু পিস্তল-ফিস্তল চুলোয় যাক—এখন আর কিছুই করবার নেই। আমরা দুজন—কোচোয়ান শুদ্ধ্ ওরা সাতজন। টেনিদার কুস্তির প্যাঁচ ট্যাঁচ কোনো কাজে লাগবে না—সোজা চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাবে।

সেই হেঁড়ে গলার লোকটা বললে, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কতক্ষণ ভ্যারেণ্ডা ভাজবে, হে। রাত তো প্রায় আটটা বাজল। চলো—চলো শিগ্‌গীর। সিন্ধুঘোটক তখন থেকে হা পিত্যেশ করে বসে আছে।

টেনিদা একবার আমার দিকে তাকালো, আমি টেনিদার দিকে তাকালুম। তারপর—কী আর করা যায়—দুজনে সুড়সুড় করে এগিয়ে চললুম লোকগুলোর সঙ্গে সঙ্গে।

কোন আদ্যিকালের একটা রদ্দিমার্কা বাড়ি—মানুষজন বিশেষ থাকে টাকে বলে মনে হল না। আস্তরখানা ভাঙা ভাঙা ঘর—কোথাও একটা তেপায়া খাটীয়া, কোথাও বা দু-একখানা ধূলোবালি মাখা টেবিল চেয়ার। দুটো লণ্ঠনের আলোয় ঘরগুলোকে যেমন বিচ্ছিরি, তেমনি ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। থেকে থেকে মাথার ওপর দিয়ে চামচিকে উড়ে যাচ্ছিল, তাই দেখে আমি শক্ত করে নিজের কানদুটোকে হাতচাপা দিলুম। চামচিকেকে আমার ভীষণ সন্দেহ-জনক মনে হয়—কেন যে হঠাৎ লোকের ঘরে ঢুকে ফরফর করে উড়তে থাকে তার কোনো মানেই বোঝা যায় না। ছোড়দি বলে

ওরা নাকি লোকের কান ধরে ঝুলে পড়তে ভীষণ ভালোবাসে। আমার লম্বা লম্বা কানদুটোকে তাই আগে থেকেই সামলে রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ বলেই মনে হল আমার।

এ ঘর থেকে ও ঘর, ও ঘর থেকে সে ঘর। তারপরের ঘরটাই বোধ হয় শ্রীঘর। ভেবেই আমার মনে হল, শ্রীঘর তো থানার হাজতকে বলে। সিন্ধুঘোটক নিশ্চয় পুলিস নয় যে আমাদের ডুম করে হাজতে পুরে দেবে।

এদিকে একটা সিঁড়ি বেয়ে আমরা ওপরে উঠছি! খুব বাজে মার্কা সিঁড়ি, রেলিং ভাঙা, ধাপগুলো দাঁত বের করে রয়েছে। ঠিক এম্‌নি একটা বাড়িতেই যত রকম ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়—দস্যুসর্দার চিং চুং বেপরোয়া গোয়েন্দা দিগ্বিজয় রায়কে গুম করে ফেলে, কিংবা কাঞ্চী-গড়ের রাজরানী মৃদুলাসুন্দরীর হীরের নেক্‌লেস নিয়ে গুণ্ডা হাতীলালের সঙ্গে ওস্তাদ কলিমুদ্দির গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বেধে যায়। আমার প্রিয় লেখক কুণ্ডু মশাইয়েরও যত সব দুর্ধর্ষ রোমাঞ্চকর কাহিনী একে একে আমার মনে পড়ে যেতে লাগল।

কিন্তু খালি একটা খট্‌কা লাগছে। সে সব গল্পে খেলনা পিস্তলের কথা কোনোদিন পড়িনি!

আমার এ-সব দারুণ দারুণ ভাবনায় হঠাৎ বাধা পড়ে গেল। সিঁড়ি পেরিয়েই সামনে মস্ত একটা ঘর। তার দরজাটা ভেজানো, কিন্তু ভেতর থেকে একটা জোরালো আলো বাইরে এসে পড়েছে। আমরা সেইখানে থেমে দাঁড়ালুম।

আর অবলাকান্ত বেশ মিহি গলায় ডাকল: স্যার!

ভেতর থেকে ব্যাঙের ডাকের মতো আওয়াজ এল: কে?

—আমরা সবাই। মানে কম্বলরাম শুদ্ধু এসে গেছে।

—এসে গেছে? অল্ রাইট্! ভেতরে চলে এসো।

অবলাকান্ত দরজাটা খুলে ফেলল। আর পেছন থেকে লোকগুলো

আমাকে আর টেনিদাকে ধাক্কা দিয়ে বললে, যাও—যাও, এবার স্যারের সঙ্গে মোকাবেলা করো।

সবাই আমরা ঘরে পা দিলুম।

বাড়িটা নীচে থেকে যতই খারাপ মনে হোক—এ ঘরটা একেবারে আলাদা। টিমটিমে লণ্ঠন নয়—মেজেতে শোঁ শোঁ করে একটা পেট্রোম্যাক্স বাতি জ্বলছে। মস্ত ফরাসের ওপর ধপধপে সাদা চাদর বিছানো, সেখানে তিনচারটে তাকিয়া, আর একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে—গড়গড়ার নল মুখে পুরে—

কে ?

কে আর হতে পারে—সিন্ধুঘোটক ছাড়া ?

চেহারা বটে একখানা! হঠাৎ দেখলে মনে হয় বোধ হয় স্বপ্ন দেখছি, নিজের কানে চিমটি কেটে পরখ করতে ইচ্ছে করে। একটা লোক যে এমন মোটা হতে পারে, এক পিপে আলকাত্‌রায় ডুব দিয়ে উঠে আসার মতো তার যে গায়ের রঙ হতে পারে, মণ চারেক শরীরের ওপর এত ছোট যে একটা মাথা থাকতে পারে, আর ছোট মাথায় যে আরো ছোট এমন দুটো কুঁৎকুঁতে চোখ থাকতে পারে—এ না দেখলে তবুও বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু দেখলে আর কিছুতেই বিশ্বাস করবার জো নেই।

আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম, 'ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টো-ফিলিস'—কিন্তু সামলে নিলুম আর সিন্ধুঘোটক ব্যাঙের গলায় গ্যাং গ্যাং করে বললে, বোসো সব, সিট্ ডাউন।

এমন কায়দা করে বললে যে, আমরা যেন সব স্কুলের ছাত্র আর হেড্‌মাস্টার আমাদের বসতে হুকুম দিচ্ছেন।

ঘেঁটুদা কাঁউমাউ করে বললে, আমি বসতে পারব না স্যার—এই কম্বলরামটা আমাকে গোবরের ভেতরে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছে। গায়ে দারুণ গন্ধ।

সিন্ধুঘোটক বললে, তুমি একটা থার্ডক্লাস। আমার ফরাসে গোবর লাগিয়ো না—আগে চান করে এসো। যাও—গেট্ আউট্!

ঘেঁটুদা তখুনি সুড় সুড় করে বেরিয়ে গেল।

আমরা সবাই তখন ফরাসে বসে পড়েছি, সিন্ধুঘোটক তাকিয়া ছেড়ে পিঠ খাড়া করে উঠে বসল। জিজ্ঞেস করলে, কে কম্বলরাম?

অবলাকান্ত টেনিদাকে একটা খোঁচা দিয়ে বললে, এইটে।

সিন্ধুঘোটক আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, আর রোগা চিম্‌টে খাড়া-খাড়া কানওলা ওটা কে?

অবলাকান্ত বললে, নাম জানিনে স্যার। কম্বলরামের দোস্ত—কাঁথারাম বোধ হয়।

হেঁড়ে গলায় লোকটা বললে, সতরঞ্চিরাম হতেও বাধা নেই।

বাকী সবাই একসঙ্গে বললে, হাঁ, সতরঞ্চিরামও হওয়া সম্ভব।

সিন্ধুঘোটক বললে, অর্ডার—অর্ডার!—বলেই আবার গড়গড়ার নলটা মুখে তুলে নিলে। আর এইবার আমি লক্ষ্য করে দেখলুম, গড়গড়ায় কলকে-টলকে কিচ্ছু নেই, শুধু শুধু একটা নল মুখে পুরে সিন্ধুঘোটক বসে আছে।

—তারপর কম্বলরাম—

এতক্ষণ টেনিদা আলু-চচ্চড়ির মতো মুখ করে বসেছিল, এবার গাঁ গাঁ করে উঠল।

—দেখুন স্যার, এরা গোড়া থেকেই ভুল করেছে। আমি তো কম্বলরাম নই-ই, আমাদের সাতপুরুষের মধ্যে কেউ কম্বলরাম নেই। আমি হচ্ছি টেনি শর্মা—ওরফে ভজহরি মুখুজ্জে, আর এ হল প্যালারাম—ওর ভালো নাম স্বর্ণেন্দু ব্যানার্জি। আমরা পটলডাঙায় থাকি। গরমের জ্বালায় অস্থির হয়ে আমরা গঙ্গায় স্নিগ্ধ সমীর সেবন করছিলুম। আপনার ঘেঁটুচন্দর আর অবলাকান্ত গিয়ে আমাদের জোর করে ধরে এনেছে।

শুনে, সিন্ধুঘোটকের মুখ থেকে টপ করে নলটা পড়ে গেল। তিনটে কোলা ব্যাঙের ডাক একসঙ্গে গলায় মিশিয়ে সিন্ধুঘোটক প্রায় হাহাকার করে উঠল : ওহে অবলাকান্ত, এরা কী বলে ?

অবলাকান্ত ব্যস্ত হয়ে বললে, বাজে কথা বলছে, স্যার। এই কম্বলরামটা দারুণ খলিফা—তখন থেকে আমাদের সমানে ভোগাচ্ছে। আপনিই ভালো করে দেখুন না, স্যার। কম্বলরাম ছাড়া এমন চেহারা কারুর হয় ? এমন লম্বা তাগড়াই চেহারা, এমন একখানা মৈনাকের মতো খাড়া নাক, এম্‌নি তোবড়ানো চোয়াল—

—দাঁড়াও—দাঁড়াও !—সিন্ধুঘোটক হঠাৎ তার ছোট্ট মাথা আর কুঁৎকুঁতে চোখ দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলে : কিন্তু কম্বলরামের নাকের পাশে যে একটা কালো জড়ুল ছিল, সেটা কোথায় ?

সঙ্গে সঙ্গে বাকী লোকগুলো সবাই ঝুঁকে পড়ল টেনিদার মুখের ওপর : তাই তো, জড়ুলটা কোথায় ?

টেনিদা খ্যাঁচম্যাচ করে বললে, আমি কি কম্বলরাম যে জড়ুল থাকবে ? এইবার আপনারাই বলুন তো মশাই, এই দারুণ গ্রীষ্মের সন্ধ্যেবেলায় খামোকা দুটো ভদ্রসন্তানকে হয়রান করে আপনাদের কী লাভ হল ?

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর সিন্ধুঘোটক ডাকল : অবলাকান্ত !

—বলুন স্যার !

—এটা কী হল ?

—আজ্ঞে, অন্ধকার স্যার—ভালো করে ঠাওর পাইনি।—

মাথা চুলকোতে চুলকোতে অবলাকান্ত বললে, কিন্তু আমার মনে হয় স্যার, এটাই কম্বলরাম। চালাকি করে জড়ুলটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।

শাট্‌ আপ ! জড়ুল কি একটা মার্বেল যে ফস করে লুকিয়ে ফেলা যায় ?

নায় ?

ল একটা কথা বটে।—সিন্ধুঘোটক আবার নলটা তুলে

..। ঃ কিন্তু অপারেশনের দাগটা তো থাকবে।

—নাও থাকতে পারে স্যার। আজকাল ডাক্তারদের অসাধ্য কাজ নেই।

টেনিদা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দোরগোড়া থেকে কোচোয়ান বললে, হুজুর, আমার একটা নিবেদন আছে।

—বলে ফেলো পাঁচকড়ি! আউট্ উইথ্ ইট্।

—কম্বলরামকে আমি চিনি, স্যার। রোজ বিকেলে মনুমেন্টের নীচে আমরা খৈনি খাই। সে কলকাতায় নেই, আজ দুপুরবেলায় রেলে চেপে তার মামাবাড়ি বাঁকুড়া চলে গেছে।

শুনে, অবলাকান্ত তড়াং করে লাফিয়ে উঠল। পাঁচকড়িকে এই মারে তো সেই মারে!

—তবে এতক্ষণ বলিসনি কেন হতভাগা বুদ্ধু কোথাকার? খামোকা আমাদের খাটিয়ে মারলি?

—বলে কী হবে? আমাদের কথা তো কেউ বিশ্বাস করে না।—বলে, ভারী নিশ্চিন্ত মনে পাঁচকড়ি হাতের মুঠোয় খৈনি ডলতে লাগল আর গুনগুনিয়ে গান ধরল: 'বনে চলে সিয়ারাম, পিছে লছ্মন ভাই—'

সিন্ধুঘোটক বললে, অর্ডার, অর্ডার। পাঁচকড়ি, নো সিংগিং নাউ! কিন্তু এ পরিস্থিতিতে কী করা যায়?

অবলাকান্ত প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে রইল। আর বাকী সবাই একসঙ্গে বললে, তাই তো, কী করা যায়।

টেনিদা বললে, কিছুই করবার দরকার নেই স্যার। বেশ রাত হয়েছে, আমাদের তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন, নইলে বাড়িতে গিয়ে বকুনি খেতে হবে।

সিন্ধুঘোটক কিছুক্ষণ খালি খালি গড়গড়া টানতে লাগল। কলকে-টলকে কিচ্ছু নেই, শুধু গড়গড়ার ভেতর থেকে উঠতে লাগল জলের গুড়গুড় আওয়াজ।

তারপর সিন্ধুঘোটক বললে, হয়েছে।

অবলাকান্ত ছাড়া বাকী সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, কী হয়েছে।

—প্ল্যান। কম্বলরাম যখন নেই, তখন একে দিয়েই কাজ চালাতে হবে। নাকের নীচে একটা জড়ুল বসিয়ে দিলেই ব্যাস্—কেউ আর চিনতে পারবে না।

অবলাকান্ত ভারী খুশি হয়ে হাত কচলাতে লাগল ঃ আমিও তো স্যার সেই কথাই বলছিলুম।

হায়—হায়, ঘাটে এসে শেষে নৌকো ডুবল। এতক্ষণ বেশ আরাম বোধ করছিলুম, কিন্তু সিন্ধুঘোটকের কথায় একেবারে ধুক্ করে নিবে গেল বুকভরা আশা। টেনিদার দিকে চেয়ে দেখলুম, ওর মুখখানা যেন ফজলী আমের মতো লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে।

টেনিদা শেষ চেষ্টা করল ঃ স্যার, আমাদের আর মিথ্যে হ্যারাস্ করবেন না। ভুল যখন বুঝেইছেন—

সিন্ধুঘোটক এবার কুঁৎকুঁতে চোখ মেলে টেনিদার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকটা। কী ভেবে মিনিট খানেক খ্যাক খ্যাক করে হাসল, তারপর বললে, আচ্ছা ছোকরারা, তোমরা আমাদের কী ভেবেছ বলো দেখি? রাক্ষস? খপ করে খেয়ে ফেলব?

ভাবলে অন্যায় হয় না—অন্তত সিন্ধুঘোটকের চেহারা দেখলে সেই রকমই সন্দেহ হয়। একক্ষণে আমি বললুম, আমরা কিছুই ভাবছি না স্যার, কিন্তু বাড়ি ফিরতে আর দেরী হলে বড়দা আমার কান ধরে—

—হ্যাং ইয়োর বড়দা।—সিন্ধুঘোটক বিরক্ত হয়ে বললে, তোমার কানদুটো এমনিতেই বেশ বড়ো রয়েছে, একটু ছাঁটাই করে দিলে

নেহাৎ মন্দ হবে না। ও-সব বাজে কথা রাখো। তোমাদের দিয়ে আজ রাতে আমরা একটা মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চাই। যদি সফল হই—তোমাদের খুশি করে রিওয়ার্ড দেব।

—মহৎ উদ্দেশ্য!—টেনিদা চিড়বিড় করে উঠল: এইভাবে ভদ্দর লোকদের পথ থেকে পাকড়াও করে এনে কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে স্যার?

সিন্ধুঘোটক চটে বললে, চোপরাও? এই বাড়ির পেছনে একটা পচা ডোবা আছে, তাতে কিলবিল করছে জোঁক। বেশি চালাকি করো তো, দুজনকে আধঘণ্টা তার মধ্যে চুবিয়ে রাখব!

শুনে আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল! জোঁক আমি কখনো দেখিনি কিন্তু তারা কী করে কুটুস্ করে মানুষকে কামড়ে ধরে নিঃশব্দে রক্ত শুষে খায়, তার ভয়াবহ বিবরণ অনেক শুনেছি। তা থেকে জানি, আর যাই হোক, জোঁকের সঙ্গে কখনো 'জোক' চলে না।

টেনিদা হাউ হাউ করে বললে, না স্যার, জোঁক নয়, জোঁক নয়! ওরা খুব বাজে জিনিস।

—তাহলে আমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাও।

—কী করতে হবে, স্যার?

—বেশি কিছু নয়। শুধু একজনের পকেট থেকে একটা কৌটো তুলে আনতে হবে। আর সে-কাজ কম্বলরাম ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না।

—কীসের কৌটো স্যার?

—জার্মান সিল্ভারের।

কী আছে তাতে?—টেনিদা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল: হীরে মুক্তো-মানিক? কোহিনুর? নাকি আরো আরো দামী, আরো অমূল্য কোনো দুর্লভ রত্ন?

সিন্ধুঘোটক গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে কিছুক্ষণ প্যাট

গাড়িতে চাপিয়ে আমাদের লোপাট করা, ভূতুড়ে পোড়ো বাড়ি, টেনিদাকে কম্বলরাম আর আমাকে কাঁথারাম সাজানো। এ সব ধাষ্ট্যামোর মানে কী?

লোকগুলো ফস ফস করে আঠাকাটা দিয়ে আমার মুখে খানিকটা যাচ্ছেতাই গোঁফ দাড়ি লাগিয়ে দিলে, তা থেকে আবার শুঁটকো চামচিকের মতো কী রকম যেন বিচ্ছিরি গন্ধ আসছিল। আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের চেহারা দেখে আমার তাক লেগে গেল—ঠিক আমাদের পাড়ার হ্যাদাপাগলের মতো দেখাচ্ছে—যে লোকটা হাঁটু অবধি একটা খাকি শার্ট ঝুলিয়ে গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা পরে, হাতে একটা ভাঙা লাঠি নিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তায় ট্রাফিক কণ্ট্রোল করতে চেষ্টা করে। আর টেনিদার মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা তিন চারদিনের না কামানো দাড়ি, নাকের পাশে ইয়া বড়ো এক কটকটে জড়ুল।

আমি কাঁথারাম কিংবা হ্যাদাপাগলা যা-ই হই, টেনিদা যে মোক্ষম একটি কম্বলরাম, তাতে আমার আর এতটুকু সন্দেহ রইল না। এমন কি, একথাও মনে হতে লাগলো যে আসলে টেনিদা ছদ্মবেশী কম্বলরাম ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সব মিলিয়ে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? এ সব সাজগোজ ক'রে আমরা যাব কোথায়, আর এই রাতে? এই পোড়োবাড়িতে, ফিল্মস্টার বিজয়-কুমারের পকেটটাই বা পাওয়া যাবে কোথায়, যে আমরা ফস করে তা থেকে নস্যির কৌটো লোপাট করে দেব?

আমি মুখ কাঁচুমাচু করে বললুম, বিজয়কুমার কোথায় আছেন স্যার?

যে লোকটা আমার মুখে দাড়িগোঁফ লাগাচ্ছিল, সে বললে, আছে কাছাকাছি কোথাও। সময় হলেই জানতে পারবে।

কিন্তু তাঁর পকেট মারবার জন্যে আমাদের ধরে আনা কেন?

—টেনিদা গোঁ গোঁ করে বললে, আমরা ও সব কাজ কোনোদিন করিনি। আমরা ভালো ছেলে—কলেজে পড়ি।

আর একজন বললে, থামো হে কম্বলরাম, বেশি ফটফট কোরো না। তোমার গুণের কথা কে জানে না, তাই শুনি? বলি, বিজয়-কুমারের খাস চাকর হিসেবে তার পকেট থেকে রোজ পয়সা হাতাও নি তুমি? দু'বার সে তোমায় বলেনি,—এই ব্যাটা কম্বল, তোর জ্বালায় আমি আর পারি না—তুই আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা? নেহাৎ কান্নাকাটি করেছিলে বলে আর তোমার রান্না মোগলাই-কারী না হলে বিজয়কুমারের খাওয়া হয় না বলেই তোমার চাকরিটা যায়নি? তুমি বলতে চাও, এগুলো সব মিথ্যে কথা।

টেনিদা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললে, কেন বারবার বাজে কথা বলছেন? আমি কম্বলরাম নই।

—এতক্ষণ ছিলে না। কিন্তু এখন আর সে কথা বলবার জো নেই। শ্রীমান কম্বলরাম নিজে সামনে এসে দাঁড়ালেও এখন ফয়শালা করা শক্ত হবে কে আসল আর কে নকল। বুঝলে ছোকরা, আমার হাতের কাজই আলাদা। টালা থেকে টালীগঞ্জ পর্যন্ত যত থিয়েটার হয়, তাদের কোনো মেক-আপম্যান আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। তোমাকে যা সাজিয়েছি না,—চোখ থাকলে তার কদর বুঝতে।

—কদর বুঝে আর দরকার নেই। এখন বলুন, আমাদের এই সং সাজিয়ে আপনাদের কী লাভ হচ্ছে।

—এত কষ্ট করে তোমাকে কম্বলরাম বানালুম, আর তুমি বলছ সং!—লোকটা ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: মনে ভারী ব্যথা পেলুম হে ছোকরা, ভারী ব্যথা পেলুম। নাও, চলো এখন সিন্ধু-ঘোটকের কাছে। তিনিই বলে দেবেন, কী করতে হবে।

আবার সুড়সুড় করে দোতলায় যেতে হল আমাদের। কথা

বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই—সে তো বোঝাই যাচ্ছে। শুধু এইটেই বোঝা যাচ্ছে না যে বিজয়কুমারের পকেট হাতড়াবার জন্যে আমাদের ধরে আনা কেন? ও তো সিন্ধুঘোটকের দলের যে কেউ করতে পারত—লোকগুলোকে দেখলেই ছ্যাঁচড়া আর গাঁটকাটা বলে সন্দেহ হয়।

তা ছাড়া পকেট মারতে গিয়ে যদি ধরা পড়ি—

ধরা পড়লে কী হবে তা অবিশ্যি বলবার দরকার নেই। তখন রাস্তাশুদ্ধ লোক একেবারে পাইকারী হারে কিলোতে আরম্ভ করবে। হিতোপদেশের সেই 'কীলোৎপাটীত বানরঃ'—অর্থাৎ কিনা কিলের চোটে দাঁতের পাটি-ফাটি সব উপড়ে যাবে আমাদের।

কিন্তু কাজটা বোধ হয় টেনিদা—ওরফে কম্বলরামকেই করতে হবে, কাজেই কিলচড় আমার বরাতে না-ও জুটতে পারে। তা ছাড়া টেনিদার ঠ্যাং ছুটোও বেশ লম্বা লম্বা। বেগতিক বুঝলে তিনলাফে এক মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে পারে। দেখাই যাক না কী হয়।

আর সত্যি বলতে কী, এতক্ষণে আমারও কেমন একটা উত্তেজনা হচ্ছিল। কলকাতায় এই দারুণ গরম—চটচটে ঘাম আর রাত্তিরে বিচ্ছিরি গুমোট—সব মিলে মন মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এমন কি, গঙ্গার ধারের শীতল সমীরেও যে খুব আরাম হচ্ছিল তা নয়। তারপরেই ঘেঁটুদা আর অবলাকান্ত এসে হাজির। দিব্যি জমে উঠেছিল, বিরাট একটা সিন্ধুঘোটক ছিল, বেশ একটা ভীষণ রকমের কিছু রোমাঞ্চকর ব্যাপার ঘটবে এমনি মনে হচ্ছিল, কিন্তু একটা নস্যির কৌটোতেই সব গোলমাল করে দিচ্ছে। একটা হীরে মুক্তো হলেও ব্যাপারটা কিছু বোঝা যেত, কিন্তু—

সিন্ধুঘোটক সমানে গড়গড়া টানছে—আশ্চর্য, কল্‌কে যে নেই সেটা কি ওর খেয়ালই হয় না? নাকি, বিনা কলকেতেই গড়গড়া খাওয়াই ওর অভ্যেস। কে জানে!

আমরা ঘরে যেতেই সিন্ধুঘোটক কটমট করে তাকালো আমার দিকে।

—এটা আবার কে? কোন পাগলাগারদ থেকে একে ধরে আনলে?

—আজ্ঞে, পাগলা-গারদের আসামী নয়, ও কাঁথারাম।

—ওটাকে সাজাতে গেলে কেন?

—এমনি একটু হাত-মক্শো করলুম, আজ্ঞে।—যে আমার মুখে বাব্বু গোঁফদাড়ি লাগিয়ে দিয়েছিল, সে একগাল হেসে জবাব দিল।

—কম্বলরামটা খাসা হয়েছে। হাঁ—নিখুঁত।—সিন্ধুঘোটক গড়াগড়া রেখে উঠে দাঁড়ালো, তারপর এগিয়ে এল আমাদের দিকে। ঠিক যেন শুঁড়কাটা একটা হাতি দু-পায়ে এগিয়ে এল দুলতে দুলতে।

প্রথমেই টেনিদার নাকটা নেড়ে চেড়ে দেখল, তারপর আঙুল দিয়ে জড়ুলটা পরখ করল, তারপর একটা কান ধরে একটু টানল। টেনিদার মুখটা রাগের চোটে ঠিক একটা বেগুনের মতো হয়ে যাচ্ছিল—এ আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। কিন্তু কিছু করবার জো নেই—অনেকগুলো লোক রয়েছে চারপাশে, টেনিদা শুধু গোঁ গোঁ করতে লাগল।

—কান ধরছেন কেন, স্যার?

—কেন, অপমান হল নাকি?—সিন্ধুঘোটক একরাশ দাঁত বে'র করে খ্যাঁক্-খ্যাক্ করে হেসে উঠল: ওহে, মজার কথা শুনেছ? কম্বলরামের অপমান হচ্ছে।

ঘরশুদ্ধু লোক অমনি একসঙ্গে ঘোঁক ঘোঁক করে হেসে উঠল। সব চাইতে বেশি করে হাসল ঘেঁটুদা, টেনিদা যাকে ল্যাং মেরে গোবরের ভেতর ফেলে দিয়েছিল।

হাসি থামলে সিন্ধুঘোটক বললে, যাক—আর সময় নষ্ট করে দরকার নেই! এবার অ্যাক্শন!

—অ্যাক্শন।—শুনেই আমার পিলে-টিলে কেমন চমকে উঠল, আমি টেনিদার দিকে চাইলুম। দেখলুম খাঁড়ার মতো নাকটা যেন অনেকখানি খাড়া হয়ে উঠেছে, রাগে চোখ দুটো দিয়ে আগুন ছুটছে।

৫

সেই বাড়ি থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লুম আবার। এবার আর ঘোড়ার গাড়িতে নয়, স্রেফ পাঁওদলে। আমাদের ঘিরে ঘিরে চলল আরো জনসাতেক লোক।

রাস্তাটা এবড়ো-খেবড়ো—দূরে দূরে মিটমিটিয়ে আলো জ্বলছে। পথের ধারে কাঁচা ড্রেন, কচুরিপানা, ঝোপজঙ্গল, কতগুলো ছাড়া ছাড়া বাড়ি, কয়েকটা ঠেলাগাড়িও পড়ে আছে এদিক-ওদিক। দুজন লোক আসছিল—ভাবলুম চেঁচিয়ে উঠি, কিন্তু তক্ষুনি আমার কানের কাছে কে যেন ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে বন-বেড়ালের মতো বললে, এই ছোক্রা একেবারে স্পীকটি নট্! চেঁচিয়েছিস কি তক্ষুনি মরেছিস, এবার খেল্না পিস্তল নয়—সঙ্গে ছোরা আছে!

লোক দুটো বোধ হয় কুলি-টুলি হবে, যেতে যেতে কটমটিয়ে কয়েকবার চেয়ে দেখল আমাদের দিকে। আমি প্রায় ভাঙা গলায় বলতে যাচ্ছিলুম—'বাঁচাও ভাই সব—' কিন্তু ছোরার ভয়ে নিজের আর্তনাদটাকে কোঁৎ করে গিলে ফেলতে হল।

এর মধ্যে টেনিদা একবার আমার হাতে চিমটি কাটল। যেন বলতে চাইল,—এই—চুপ করে থাক।

হঠাৎ লোকগুলো আর একটা ছোট রাস্তার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। একজন সেই রাস্তা বরাবর আঙুল বাড়িয়ে বললে, দেখতে পাচ্ছ?

আমরা দেখতে পেলুম।

রাস্তাটা বেশি দূর যায়নি—দু-পাশে কয়েকটা ঘুমিয়ে পড়া

টিনের ঘর রেখে আন্দাজ দুশো গজ দূরে গিয়ে থমকে গেছে ? সেখানে একটা মস্তবড় লোহার ফটক, তাতে জোরালো ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছে আর ফটকের মাথার ওপর লেখা রয়েছে : 'জয় মা তারা স্টুডিয়ো।'

ঘেঁটুদা বললে, চলে যাও—ওইখানেই তোমাদের কাজ। এই কাঁথারামকেও সঙ্গে নিয়ো—নস্যির কৌটোটা বিজয়কুমারের পকেট থেকে লোপাট করে এর হাতে দেবে তারপর যেমন গিয়েছিলে—সুট করে বেরিয়ে আসবে। ব্যস, তা হলেই কাজ হাঁসিল। তারপরেই তোমাদের হাত ভরে প্রাইজ দেবে সিন্ধুঘোটক।

—কিন্তু একটা নস্যির কৌটোর জন্যে—আমি গজগজ করে উঠলুম।

—নিশ্চয় নিদারুণ রহস্য আছে।—ঘেঁটুদা আবার বললে : কিন্তু তা জেনে তোমাদের কোনো দরকার নেই। এখন যা বলছি, তাই করো। সাবধান—স্টুডিয়োর ভিতরে গিয়ে যদি কোনো কথা ফাঁস করে দাও, কিম্বা পালাতে চেষ্টা করো, তা হলে কিন্তু নিদারুণ বিপদে পড়বে। সিন্ধুঘোটকের নজরে পড়লে একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত লুকিয়ে বাঁচতে পারে না, সেটা খেয়াল রেখো।

টেনিদা বললে, খেয়াল থাকবে।

ঘেঁটুদা আবার বললে, আমরা সব এখানেই রইলুম। গেটের দারোয়ান বিজয়কুমারের পেয়ারের চাকর কম্বলরামকে চেনে—তোমাকে বাধা দেবে না। আর তুমি কাঁথারামকেও নিজের ভাই বলে চালিয়ে দেবে। গেট দিয়ে ঢুকে একটু এগিয়েই দেখবে গুদামের মতো প্রকাণ্ড একটা টিনের ঘর—তার উপর লেখা রয়েছে ইংরেজিতে—২। ওটাই হচ্ছে দু নম্বর ফ্লোর, ওখানেই বিজয়কুমারের শুটিং হচ্ছে।

—ফ্লোর! শুটিং! এ সব আবার কী ব্যাপার ?—টেনিদা ঘাবড়ে গিয়ে জানতে চাইল : ওখানে আবার গুলিগোলার কোন ব্যাপার আছে নাকি ?

—আরে না—না, ও সমস্ত কোনো ঝামেলা নেই। বললুম তো ফ্লোর হচ্ছে গুদামের মতো একরকমের ঘর, ওখানে নানারকম দৃশ্যট্‌শ্য তৈরী করে সেখানে ফিলিম তোলা হয়। আর শুটিং হল গিয়ে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা।—কাউকে গুলি করার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

—বুঝতে পারলুম। আচ্ছা—তু'নম্বর ফ্লোরে না হয় গেলুম—সেখানে না হয় দেখলুম, বিজয়কুমারের শুটিং হচ্ছে—তখন কী করব?

সুযোগ বুঝে তার কাছে গুটি গুটি এগিয়ে যাবে। সে হয়তো জিজ্ঞেস করবে, কীরে কম্বুলে, দেশে গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে চলে এলি যে? আর স্টুডিয়োতেই বা এলি কেন? উত্তরে তুমি বলবে, 'কী করব স্যার—দেশের বাড়িতে গিয়েই আপনার সম্পোকে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখলুম—মেজাজ খিঁচড়ে গেল এজ্ঞে, তাই চলে এলুম। শুনলুম আপনি স্টুডিয়োতে এয়েচেন, তাই দর্শন করে চক্ষু সাথ্থক করে গেলুম!' শুনে বিজয়কুমার হয়তো হেসে বলবে, 'ব্যাটা তো মহা খলিফা'—বলে তোমার পিঠে চাপড় দেবে, আর একটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বলবে, 'নে—কিছু মিষ্টি-ফিষ্টি খেয়ে বাড়ি চলে যা। আমার ফিরতে রাত হবে, পারিস তো ভালো দেখে একটা মুরগীর রোস্ট্ করে রাখিস।' যখন এই সব কথা বলতে থাকবে, তখন সেই ফাঁকে তুমি চট করে তার পকেট থেকে নস্যির ডিবেটা তুলে নেবে।

—যদি ধরা পড়ে যাই?

—বলবে, পকেট মারিনি স্যার, একটা পিঁপড়ে উঠছিল, তাই ঝাড়ছিলুম।

—যদি বিশ্বাস না করে?

—অভিমান করে বলবে, স্যার, আমার কথায় অবিশ্বাস? আমি আর এ পোড়ামুখ দেখাব না—গঙ্গায় ডুবে মরব। বলতে বলতে কাঁদতে থাকবে। বিজয়কুমার বলবে—কী মুশকিল—কী মুশকিল!

তখন তার পা জড়িয়ে ধরার কায়দা করে তাকে পটকে দেবে। আর ধাঁই করে যদি একবার আছাড় খায়, আর ভাবতে হবে না—তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে—বুঝেছ ?

টেনিদা বললে, বুঝেছি।

—তা হলে এগোও।

—এগোচ্ছি।

—খবর্দার, কোনো রকম চালাকি করতে যেয়ো না, তা হলেই—

আজ্ঞে জানি, মারা পড়ব।

ঘেঁটুদা খুশি হয়ে বললে, সাবাস—ঠিক আছে। এবার এগিয়ে যাও—

টেনিদা বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, এগিয়ে চললুম।

আমরা দুজনে গুটিগুটি 'জয় মা তারা' স্টুডিয়োর দিকে চলতে লাগলুম। ওরা যে কোথায় কোন্‌খানে ভুট্ করে লুকিয়ে গেল, আমরা পেছন ফিরেও আর দেখতে পেলুম না।

আমি চাপা গলায় বললুম, টেনিদা ?

—হুঁ।

—এই তো সুযোগ।

টেনিদা আবার বললে, হুঁ!

—সমানে হুঁ-হুঁ করছ কী ? এখন ওরা কেউ কোথাও নেই—আমরা মুক্ত—এখন একেবারে বেপরোয়া হয়ে—মানে যাকে বলে উদ্দাম উল্লাসে ছুটে পালাতে পারি এখান থেকে ; ফিলিম স্টুডিয়ো যখন রয়েছে, তখন জায়গাটা নিশ্চয় টালিগঞ্জ। আমরা যদি 'জয় মা তারা' স্টুডিয়োতে না গিয়ে পাশের খানাখন্দ ভেঙে এখন চোঁ চাঁ ছুটতে থাকি, তা হলে—

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, এখন কুরুবকের মতো বকবক করিসনি প্যালা, আমি ভাবছি।

—কী ভাবছ ? সত্যি সত্যিই তুমি স্টুডিয়োতে ঢুকে ফিল্মস্টার বিজয়কুমারের পকেট মারবে নাকি ?

—শার্ট আপ। এখন সামনে পুঁদিচ্চেরি।

খুব জটিল সমস্যায় পড়লে টেনিদা বরাবর ফরাসী আউড়ে থাকে। আমি বললুম, পুঁদিচ্চেরি ? সে তো পণ্ডিচেরী। এখানে তুমি পণ্ডিচেরী পেলে কোথায় ?

—আঃ, পণ্ডিচেরী নয়, আমি বলছিলুম, ব্যাপার অত্যন্ত ঘোরালো। বুদ্ধি করতে হবে।

আমি বললুম, কখন বুদ্ধি করবে ? এদিকে আমাকে আবার এক বিদিকিচ্ছিরি পাগল সাজিয়েছে, মুখে কিচমিচ করছে সাতরাজ্যের দাড়ি, কুটকুটুনিতে আমি তো মারা গেলুম। ওদিকে তুমি আবার চলেছ পকেট মারতে—ধরা পড়লে কিলিয়ে একেবারে কাঁটাল পাকিয়ে দেবে, এখন—

—চোপ রাও।

অগত্যা চুপ করতে হল। আর আমরা একেবারে 'জয় মা তারা' স্টুডিয়োর গেটের সামনে এসে পৌঁছলুম। ভয়ে আমার বুক দুরদুর করতে লাগল—মনে হতে লাগল, একটু পরেই একটা যাচ্ছেতাই কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।

স্টুডিয়োর লোহার ফটক আধখোলা। পাশে দারোয়ানের ঘর আর ঘরের বাইরে খালি গায়ে এক হিন্দুস্থানী জাঁদরেল দারোয়ান বসে একমনে তার আরো জাঁদরেল গোঁফজোড়াটাকে পাকিয়ে চলেছে।

টেনিদাকে দেখেই সে একগাল হেসে ফেলল।

—কেয়া ভেইয়া কম্বলরাম, সব আচ্ছা হ্যায় ?

—হাঁ সব আচ্ছা হ্যায়।

—তুম্‌হারা সাথ্‌ ই পাগ্‌লা কৌন্‌ হো ?

আমাকেই পাগল বলছে নিশ্চয়। যে-লোকটা আমার হাতের

কাছে পেয়ে মনের সুখে মেক আপ দিয়েছিল, তাকে আমার স্রেফ কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করল; প্রায় বলতে যাচ্ছিলুম, হাম্ পাগলা নেহি হ্যায়, পটলডাঙাকা প্যালারাম হ্যায়, কিন্তু টেনিদার একটা চিমটি খেয়েই আমি থেমে গেলুম।

টেনিদা বললে, ই পাগলা নাহি হ্যায়—ই হ্যায় আমার ছোট ভাই কাঁথারাম।

—কাঁথারাম?—দারোয়ান হাঁ করে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বললে, রাম—রাম—সিয়ারাম! রামজীনে দুনিয়ামে কেত্না আজীব চীজোঁকো পয়দা কিয়া। আচ্ছা—চলা যাও অন্দরমে। তুম্হারা বাবু দু-লম্বর মে হ্যায়—হুঁয়াই শুটিং চল রহা হ্যায়!

আমরা স্টুডিয়োর ভিতর পা দিলুম। চারিদিক গাছপালা, ফুলের বাগান, একটা পরামার্কা ফোয়ারাও দেখতে পেলুম—আর কত যে আলো জ্বলছে, কী বলব। দেখলুম সব সারি সারি গুদামের মতো উঁচু উঁচু টিনের ঘর, তাদের গায়ে বড়ো সাদা হরফে এক-দুই করে নম্বর লেখা। দেখলুম, বড়ো বড়ো মোটরভ্যানে রেডিয়োর মতো কী সব যন্ত্র নিয়ে, কানে হেডফোন লাগিয়ে কারা সব বসে আছে, আর রেডিয়োর মতো সেই যন্ত্রগুলোতে থিয়েটারের পার্ট করার মতো আওয়াজ।

প্যান্ট্‌পরা লোকজন ব্যস্ত হয়ে এপাশ ওপাশ আসা-যাওয়া করছিল, আর মাঝে মাঝে কেউ কেউ তাকিয়ে দেখছিল আমার দিকেও। একজন ফস করে এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

—বাঃ, বেশ মেক আপ হয়েছে তো! চমৎকার!

মেক আপ!

ধরে ফেলেছে!

আমার বুকের রক্ত সঙ্গে সঙ্গে জল হয়ে গেল? আমি প্রায়

হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু টেনিদা পটাং করে আমাকে চিমটি কাটল।

লোকটা আবার বললে, একস্ট্রা বুঝি ?

একস্ট্রা তো বটেই, কম্বলরামের সঙ্গে কাঁথারাম ফাউ

'কঁ' বলবার জন্যে হাঁ করেছিলুম, কিন্তু তক্ষুণি

কয়েক ধাড়ী সাইজের মশা আমার

ফস করে মুখটা বন্ধ করে ফেললু

টেনিদা বললে, হ্যাঁ স্যার, এক ন নয়, প্রবলেম নয়, একদম একস্ট্রা! আর এত বাজে এ । যে বলাই যায় না!

—বা-রে কম্বলরাম, বিজয়কুমারের সঙ্গে থেকে তো খুব কথা শিখছ দেখছি। তা এ কোন্ বইয়ের একস্ট্রা ?

—আজ্ঞে জিয়োমেট্রির। থার্ড পার্টের।

লোকটা এবারে চটে গেল। বললে, দেখো কম্বলরাম, বিজয়কুমার আদর দিয়ে দিয়ে তোমার মাথাটি খেয়েছেন। তুমি আজকাল যাকে তাকে যা খুশি তাই বলো। তুমি যদি আমার চাকর হতে, তাহলে আমি তোমায় পিটিয়ে শ্রেফ তক্তপোষ করে-দিতুম।

বলেই—হন হন করে চলে গেল সে।

আমি ভয় পেয়ে বললুম, টেনিদা—কী হচ্ছে এসব ?

টেনিদা বললে, এই তো সবে রগড় জমতে শুরু হয়েছে। চল—এবার ঢোকা যাক দু-নম্বর স্টুডিয়োতে।

স্টুডিয়ো মানে যে এমনি একখানা কাণ্ড, কে ভেবেছিল সে কথা।

সামনেই যেন থিয়েটারের ছোট একটা স্টেজ খাটানো রয়েছে, এমনি মনে হল। সেখানে ঘর রয়েছে, দাওয়া রয়েছে পেছনে, আবার সিনে আঁকা দু-দুটো নারকেল গাছও উঁকি মারছে। সে সব তো ভালোই—কিন্তু চারদিকে সে কী ব্যাপার। কত সব বড়ো বড়ো আলো, কত মোটা মোটা ইলেকট্রিকের তার, বনবনিয়ে ঘোরা সব মস্ত মস্ত পাখা। ক-জন লোক সেই দাওয়াটার ওপর আলো ফেলেছে, একজন কোটপ্যাণ্ট পরা মোটা মতন লোক বলছে: ঠিক আছে—ঠিক আছে।

ঢুকে আমরা স্রেফ হাঁ করে চেয়ে রইলুম! সিনেমা মানে যে এই রকম গোলমেলে ব্যাপার, তা কে জানত? কিছুক্ষণ আমরা কোনো কথা বলতে পারলুম না, এককোণায় দাঁড়িয়ে ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে রইলুম কেবল।

কোত্থেকে আর একজন গেঞ্জি আর প্যাণ্ট পরা লোক বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল: মনিটার।

সঙ্গে সঙ্গে মোটা লোকটা বললে, লাইট্‌স্‌!

তার আশ পাশ থেকে, ওপর থেকে—অসংখ্য সার্চলাইটের মতো আলো সেই তৈরী করা ঘরটার দাওয়ায় এসে পড়ল। মোটা লোকটা বললে, পাঁচ নম্বর কাটো।

—কার নম্বর আবার কেটে নেবে? এখানে আবার পরীক্ষা হয় নাকি?—টেনিদাকে আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলুম।

টেনিদা কুট্ করে আমার কানে একটা চিমটি দিয়ে ফ্যাস ফ্যাস করে বললে, চুপ করে থাক।

মোটা লোকটা আবার চেঁচিয়ে বললে, কেটেছ পাঁচ নম্বর?

একটা উঁচু মতন জায়গা থেকে কে যেন একটা আলোর ওপর একটুকরো পিস্‌বোর্ড ধরে বললে, কেটেছি।

গেঞ্জি আর প্যাণ্টপরা লোকটা আবার বাঁজখাঁই গলায় বললে, ডায়লগ।

আমাদের পাশ থেকে হাওয়াই শার্ট আর পায়জামা পরা বেঁটে-মতন একজন লোক মোটা একটা খাতা বগলদাবা করে এগিয়ে গেল। আর তখুনি আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলুম—কোত্থেকে সুট্‌ করে আলোর মধ্যে এসে দাঁড়ালেন—আর কেউ নয়, স্বয়ং বিজয়কুমার। তাঁর পরণে হলদে জামা—হলদে কাপড়—যেন ছট পরব সেরে চলে এসেছেন।

সেই বিজয়কুমার! যিনি ঝপাং করে নদীর পুল থেকে জলে লাফিয়ে পড়েন—চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে উধাও হয়ে যান, যিনি কখনো কচুবন কখনো বা ভ্যারেণ্ডার ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে গান গাইতে থাকেন, কথা নেই বার্তা নেই—দুম করে হঠাৎ মারা যান—সেই দুরন্ত—দুর্ধর্ষ—দুর্বার বিজয়কুমার আমাদের সামনে একেবারে সশরীরে দাঁড়িয়ে। আর ওঁরই পকেট থেকে আমাদের নস্যির কৌটটা লোপাট করে দিতে হবে।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম 'টে'—সঙ্গে সঙ্গে টেনিদা আমার কানে আবার দারুণ একটা চিমটি কষিয়ে ফ্যাস ফ্যাস করে বললে, চুপ।

আমার বুকের ভেতর তখন দুর দুর করে কাঁপছে। এখুনি—এই মুহূর্তে ভয়াবহ লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটে যাবে একটা। এত আলো, কত লোকজন—এর ভেতর থেকে নস্যির কৌটো লোপাট করা। ধরা তো পড়তেই হবে, আর স্টুডিয়োসুদ্ধ লোক সেই ফাঁকে আমাদের পিটিয়ে তুলোধোনা করে দেবে! লেপ টেপ করে ফেলাও অসম্ভব নয়।

আমি দেখলুম, বিজয়কুমার সেই পায়জামা পরা বেঁটে লোকটার

খাতা থেকে কী যেন বিড়বিড় করে পড়ে নিলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, ইয়েস—ঠিক আছে।

বলেই, এগিয়ে এসে ঘরের দাওয়াটায় বসলেন। অমনি যেন শূন্য দিয়ে একটা মাইক্রোফোন নেমে এসে ওঁর মাথার একটুখানি ওপরে থেমে দাঁড়ালো! বিজয়কুমার ভাবে গদগদ হয়ে বলতে লাগলেন: 'না—না, এ আমার মাটির ঘর, আমার স্মৃতি, আমার স্বপ্ন—এ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। জমিদারের অত্যাচারে যদি আমার প্রাণও যায়—তবু আমার ভিটে থেকে কেউ আমায় তাড়াতে পারবে না।'

আমি টেনিদার কানে কানে জিজ্ঞেস করলুম, রবিঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' ছবি হচ্ছে না?

টেনিদা বললে, তা হবে।

—তাহলে বিজয়কুমার নিশ্চয় উপেন। আমগাছ কোথায় টেনিদা? পেছনে তো দেখছি দুটো নারকেল গাছ! উপেনের যে নারকেল গাছও ছিল, কই—রবিঠাকুরের কবিতায় তো সে কথা লেখা নেই।

টেনিদা আবার আমাকে ফ্যাস ফ্যাস করে বললে, বেশি বকিস্‌নি, প্যালা। ব্যাপার এখন খুব সিরিয়াস—যাকে বলে পুঁদিচ্চেরি। এখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক—দ্যাখ্ আমি কী করি। ওই বিদিকিচ্ছিরি সিন্ধুঘোটকটাকে যদি ঠাণ্ডা না করতে পারি, নাহলে আমি পটলডাঙার টেনি শর্মাই নই।

এর মধ্যে দেখি বিজয়কুমার বলা টলা শেষ করে একখানা রুমাল নিয়ে চোখ মুছছেন। গেঞ্জী আর পেণ্টপরা মোটা লোকটা আকাশে মুখ তুলে চাঁছা গলায় চেঁচিয়ে উঠেছে: সাউণ্ড, হাউইজ্ দ্যাট? (হাউজ দ্যাট?) আর যেন আকাশবাণীর মতো কা'র মিহিসুর ভেসে আসছে: ও-কে, ও-কে—

বিজয়কুমার দাওয়া ছেড়ে উঠে পড়তেই—

টেনিদা আমার কানে কানে বললে, প্যালা, রেডি—আর বলেই ছুটে গেল বিজয়কুমারের দিকে।

—স্যার—স্যার—

বিজয়কুমার ভীষণ চমকে বললে, আরে, কম্বলরাম যে। আরে, তুই না এক মাসের জন্যে দেশে গিয়েছিলি ? কী ব্যাপার, হঠাৎ ফিরে এলি যে ? আর স্টুডিয়োতেই বা এলি কেন হঠাৎ ? কী দরকার ?

আমি দম বন্ধ করে দেখতে লাগলুম।

—স্যার, আমি কম্বলরাম নই—টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল।

—তবে কি ভোম্বলরাম ?—বিজয়কুমার খুব খানিকটা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠলেন : কোথা থেকে সিদ্ধি ফিদ্ধি খেয়ে আসিস নি তো ? যা—যা—শিগগীর বাড়ি যা, আর আমার জন্যে ভালো একটা মুরগীর রোস্ট্ পাকিয়ে রাখগে। রাত বারোটা নাগাদ আমি ফিরব।

—আমার কথা শুনুন স্যার, আপনার ঘোর বিপদ।

বিজয়কুমার দারুণ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে টেনিদার দিকে চেয়ে রইলেন : ঘোর বিপদ ? কী বকছিস কম্বলরাম ?

—আবার বলছি আপনাকে, আমি কম্বলরাম নই। আমি হচ্ছি পটলডাঙার টেনিরাম, ভালো নাম ভজহরি মুখুজ্জে !

আর বলেই টেনিদা একটানে গাল থেকে জড়ুলটা খুলে ফেলল : দেখছেন ?

—কী সর্বনাশ। বিজয়কুমার হঠাৎ হাঁউ মাঁউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন। স্টুডিয়োতে হৈ চৈ পড়ে গেল !

—কী হল স্যার ? কী হয়েছে ?

বিজয়কুমার বললেন, কম্বলরাম ওর গাল থেকে জড়ুল তুলে ফেলেছে।

সেই গেঞ্জী আর পেন্টপরা মোটা ভদ্রলোক সোজা ছুটে এলেন টেনিদার দিকে।

—হোয়াট ? জড়ুল খুলে ফেলেছে ! জড়ুল কি কখনো খোলা যায় ? আরো বিশেষ করে কম্বলরামের জড়ুল ? ইমপসিব্‌ল ! ইমপসিব্‌ল !

টেনিদা আবার মোটা গলায় বললে, এই থার্ড টাইম বলছি, আমি কম্বলরাম নই—লেপরাম, জাজিমরাম, মশারিরাম, তোষকরাম—এমনি রামেরাম—কোন রামই নই। আমি হচ্ছি পটলডাঙার ভজহরি মুখুজ্জে ! তুনিয়াসুদ্ধ লোক আমাকে এতটা কাল টেনিশর্মা বলে জানে।

স্টুডিয়োর ভেতরে একসঙ্গে আওয়াজ উঠল ঃ মাই গড্‌ !

বিজয়কুমার কেমন ভাঙ্গা গলায় বললে, তা হলে কম্বলরামের ছদ্মবেশ ধরার মানে কী ? নিশ্চয়ই একটা বদ্‌মতলব আছে। খুব সম্ভব আমাকে লোপাট করবার চেষ্টা। তারপর হয়তো কোথাও লুকিয়ে রেখে একেবারে বা একলাখ টাকার মুক্তিপণ চেয়েই চিঠি দেবে আমার বাড়িতে।

সিনেমার অমন তুর্ধর্ষ বেপরোয়া নায়ক বিজয়কুমার হঠাৎ যেন কেমন চামচিকের মতো শুঁটকো হয়ে গেলেন আর চিঁ চিঁ করে বলতে লাগলেন ঃ ওঃ গেলুম, আমি গেলুম। খুন—পুলিস—ডাকাত।

আর একজন কে চেঁচিয়ে উঠল ঃ অ্যাম্বুলেন্স—ফায়ার ব্রিগেড—সৎকার সমিতি।

কে যেন আরো জোরে চ্যাঁচাতে লাগল ঃ মড়ার খাটিয়া, হরি-সংকীর্তনের দল—

টেনিদা হঠাৎ বাঘাটে গলায় হুঙ্কার ছাড়ল ঃ সাইলেন্স।

আর সেই নিদারুণ হুঙ্কারে স্টুডিয়ো শুদ্ধ লোক কেমন ঘাবড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল !

টেনিদা বলতে লাগল ঃ সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ ! (বেশ বক্তৃতার ভঙ্গিতে হাত-পা নেড়ে বলে চলল) আপনারা মিথ্যে বিচলিত হবেন না। আমি ডাকাত নই, অত্যন্ত নিরীহ ভদ্রসন্তান। পুলিস যদি

ডাকতেই হয়, তা হলে ডেকে সিন্ধুঘোটককে গ্রেপ্তার করার জন্যে ব্যবস্থা করুন। সেই আমাদের পাঠিয়েছে বিজয়কুমারের পকেট থেকে নস্যির কৌটো—

আর বলতে হল না।

'সিন্ধুঘোটক' বলতেই সেই মোটা ভদ্রলোক—'উঃ গেলুম'—বলে একটা সোফার ওপর চিৎপাত হয়ে পড়লেন। আর 'নস্যির কৌটো' শুনেই বিজয়কুমার গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করলেন : প্যাক আপ—প্যাক আপ।

মোটা ভদ্রলোক তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন সোফা থেকে। তেড়ে গেলেন বিজয়কুমারের দিকে।

—যখনই শুনেছি সিন্ধুঘোটক তখনই জানি একটা কেলেঙ্কারী আজ হবে। কিন্তু প্যাক আপ চলবে না—আজ শুটিং হবেই।

বিজয়কুমার ভীষণ এক গর্জন করে বললেন, না,—শুটিং হবে না। ওই অযাত্রা নাম শোনবার পরে আমি কিছুতেই কাজ করব না আজ। আমার কন্‌ট্রাক্‌ট্ খারিজ করে দিন।

—খারিজ মানে?—প্যাণ্টপরা মোটা ভদ্রলোক দাপাদাপি করতে লাগলেন : খারিজ করলেই হল? পয়সা লাগে না—না? যেই শুনেছি সিন্ধুঘোটক—আমারও মাথায় খুন চেপে গেছে। এক-দুই তিন—আই মীন দশ পর্যন্ত গুণতে রাজী আছি—এর মধ্যে আপনি যদি ক্যামেরার সামনে গিয়ে না দাঁড়ান, সত্যিই একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে।

বিজয়কুমার রেগে আগুন হয়ে গেলেন। মাটিতে পা ঠুকে বললেন, কী আমাকে ভয় দেখানো। খুনোখুনি হয়ে যাবে!—আস্তিন গোটাতে গোটাতে বললেন, চলে আয় ইদিকে, এক ঘুষিতে তোর দাঁত উপড়ে দেব।

—বটে। দাঁত উপড়ে দেবে? আমাকে তুই-তোকারি!—

বলেই মোটা লোকটা বিজয়কুমারের দিকে ঝাঁপ মারল : ইঃ, ফিল্মস্টার হয়েছেন ! তারকা! যদি এক চড়ে তোকে জোনাকি বানিয়ে দিতে না পারি—

আমি হাঁ করে ব্যাপারটা দেখছিলুম আর আমার মাথার ভেতরে সব যেন কী রকম তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মোটা লোকটা ঝাঁপিয়ে এগিয়ে আসতেই কেলেঙ্কারীর চরম। ঘরভর্তি ইলেকৃট্রিকের সরুমোটা তার ছড়িয়ে ছিল, লোকটার পায়ে একটা তার জড়িয়ে গেল, হুড়ুম করে আছাড় খেলো সে। একটা আলো আছড়ে পড়ল তার সঙ্গে। তক্ষুনি দুম্—ফটাস্!

কোথা থেকে যেন কী কাণ্ড হয়ে গেল—স্টুডিয়ো জুড়ে একেবারে অথৈ অন্ধকার।

তার মধ্যে আকাশ-ফাটানো চিৎকার উঠতে লাগল : চোর—ডাকাত—খুন অ্যাম্বুলেন্স —সৎকার-সমিতি—হরি-সংকীর্তন-মড়ার খাটিয়া—

আর সেই অন্ধকারে কে যেন কাকে জাপটে ধরল, দুমদাম করে কিলোতে লাগল। অনেক গলার আওয়াজ উঠতে লাগল : মার্—মার্ - মার্—

টেনিটা টকাং করে আমার কানে একটা চিম্‌টি দিয়ে বললে, প্যালা—এবার—কুইক্—

কীসের কুইক তা আর বলতে হল না। সেই অন্ধকারের মধ্যে টেনে দৌড় লাগালুম দু-জনে।

'জয় মা তারা' স্টুডিয়োর বাইরের বাগানেও সব আলো নিভে গেছে, গেটে যে দারোয়ান বসেছিল, সে কখন গোলমাল শুনে ভেতরে ছুটে এসেছে। আমরা খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম, তারপর ঢোকবার সময় ডানদিকে যে পালানোর রাস্তা দেখেছিলুম, তাই দিয়ে আরো অনেকখানি দৌড়ে দেখি—সাম্‌নে একটা বড়ো রাস্তা।

কিন্তু সিন্ধুঘোটক ?

তার দলবল ?

না—কেউ কোথাও নেই। শুধু একটু দূরে মাটার তুলে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, আর তাতে বসে মস্ত গালপাট্টা দাড়িওলা এক শিখ ড্রাইভার এক মনে ঝিমুচ্ছে।

টেনিদা বললে, ভগবান আছেন প্যালা, আর আমাদের পায় কে! সর্দারজী—এ সর্দারজী—

সর্দারজী চোখ মেলে উঠে বসে ঘুম-ভাঙা জড়ানো-গলায় বললে, কেয়া হুয়া ?

—আপ ভাড়া যায়ে গা ?

—কাঁহে নেহি জায়েগা ? মটার তো খাড়া হ্যায়!

—তব চলিয়ে—বহুৎ জল্‌দি।

—কাঁহা ?

—পটলডাঙা!

—ঠিক হ্যায়। বৈঠিয়ে।

গাড়ি ছুটল। একটু পরেই দেখলুম আমরা রসা রোডে এসে পড়েছি। তখনো পথে সমানে লোক চলছে, ট্রাম যাচ্ছে—বাস ছুটছে।

আমি তখনো হাঁপাচ্ছি।

বললুম, টেনিদা, তা হলে সত্যিই সিন্ধুঘোটকের হাত থেকে বেঁচে গেলুম আমরা!

টেনিদা বললে, তাই তো' মনে হচ্ছে!

কিন্তু ব্যাপার কী, টেনিদা ? হঠাৎ গেঞ্জী-পরা ঐ মোটা লোকটা অত চটে গেল কেন, আর নস্যির কৌটোর কথা শুনেই বা বিজয়কুমার—

টেনিদা কটাং করে আমায় একটা চিমটি কেটে বললে, চুলোয়

যাক। পড়ে মরুক তোর সিন্ধুঘোটক, আর যমের বাড়ি যাক্ তোর ঐ বিজয়কুমার। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচি আমরা দুজনে।

আমাদের নিয়ে গাড়ি যখন পটলডাঙার মোড়ে এসে থামলো—তখন মহাবীরের পানের দোকানের ঘড়িতে দেখি—ঠিক দশটা বাজতে আট মিনিট।

মাত্র তিন ঘণ্টা!

তিন ঘণ্টার মধ্যে এত কাণ্ড—একেবারে রহস্যের খাসমহল! কিন্তু তখনও কিছু বাকী ছিল।

টেনিদা বললে, সর্দারজী, কেত্না হুয়া?

পরিষ্কার বাংলায় সর্দারজী বললে, পয়সা লাগবে না—বাড়ী চলে যাও!

আমরা দুজনেই একসঙ্গে চমকে উঠলুম—সে কী!

হঠাৎ সর্দারজী হা-হা করে হেসে উঠল। একটানে দাড়িটা খুলে ফেলে বললে, চিনতে পারছ?

আমরা লাফিয়ে পেছনে সরে গেলুম। টেনিদার মুখ থেকে বেরুল: ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস!

সর্দারজী আর কেউ নয়—স্বয়ং সেই অবলাকান্ত। সেই মেফিস্টোফিলিসদের একজন!

আর একবার অট্টহাসি, তারপরেই তীরবেগে ট্যাক্সিটা শিয়ালদার দিকে ছুটে চলল।

আমি বুদ্ধি করে নম্বরটা পড়তে চেষ্টা করলুম, কিন্তু পড়া গেল না—একরাশ নীল ধোঁয়া বেরিয়ে গাড়ির পেছনের নম্বর-টম্বর সব ঢেকে দিয়েছে।

৭

সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম—বেশ ভালো একটা উপদেশপূর্ণ ইংরেজী বই, এইসব বলে-টলে তো কোনো মতে বাড়ির বকুনির হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। কিন্তু মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে রইল। বলতে ভুলে গেছি, গাড়িতে বসেই মুখের রং-টংগুলো ঘসে-ঘসে তুলে ফেলেছিলুম—আর বাড়িতে ঢুকেই সোজা বাথরুমে ঢুকে একদম সাফসুফ হয়ে নিয়েছিলুম। ভাগ্যিস, অত রাতে কারো ভালো করে নজরে পড়েনি, নইলে শেষ পর্যন্ত হয়তো একটা কেলেঙ্কারীই হয়ে যেত।

কিন্তু ব্যাপারটা কী হল? কেন আমাদের অমন করে ধরে নিয়ে গেল সিন্ধুঘোটক, কেনই বা মুখে রং মেখে সং সাজাল, আর জয় মা তারা স্টুডিয়োর ভেতরেই বা এ-সব কাণ্ড কেন ঘটে গেল—সে-সবের কোনো মানেই বা বোঝা যাচ্ছে না! আরো বোঝা যাচ্ছে না, দাড়ি লাগিয়ে অবলাকান্ত কেনই আমাদের বিনে পয়সায় পেঁৗছে দিলে, আমরা বিজয়কুমারের নস্যির কৌটো লোপাট না করেই পালিয়ে এসেছি জেনেও হাতে পেয়ে সে আমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে গুম করল না কেন!

ভীষণ গোলমেলে সব ব্যাপার! মানে, সেই সব অঙ্কের চাইতেও গোলমেলে—যেখানে দশমিকের মাথার ওপর আবার একটা ভেঙ্কুলাম থাকে, কিংবা তেল মাখা উঁচু বাঁশের ওপর থেকে এক কাঁদি কলা নামাতে গিয়ে একটা বাঁদর ছ'ইঞ্চি ওঠে তো সোয়া পাঁচ ইঞ্চি পিছলে নেমে আসে।

সকালে বসে বসে এই সব যতই ভাবছি, ততই আমার চাঁদির ওপরটা সুরসুর করছে, গলার ভেতরটা কুটকুট করছে, কানের মাঝপথে কটকট করছে আর নাকের দু-পাশে সুড়সুড় করছে। ভেবে

চিন্তে থই না পেয়ে শেষে মনের দুঃখে টেবিল বাজিয়ে বাজিয়ে আমি সত্যেন দত্তের লেখা বিখ্যাত সেই ভুবনের গানটা গাইতে শুরু করে দিলুম :

'ভুবন নামেতে ব্যাদ্‌ড়া বালক
তার ছিল এক মাসী,
আহা—ভুবনের দোষ দেখে দেখিত না
সে মাসী সর্বনাশী।
শেষে—কলাচুরি মূলোচুরি করে বাড়ে
ভুবনের আশ্‌ কারা,
চোর হতে পাকা ডাকাত হল সে
ব্যবসা মানুষ মারা—'

এই পর্যন্ত বেশ করুণ গলায় গেয়েছি, এমন সময় হঠাৎ তেতলা থেকে এ্যায়সা মোটা ডাক্তারী বই হাতে নিয়ে মেজদা তেড়ে নেমে এল।

এই প্যালা, কী হচ্ছে এই সকাল বেলায় ?

বললুম; গান গাইছি।

—এর নাম গান ? এতো দেখছি একসঙ্গে স্টেন-গান, ব্রেন-গান অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট গান—মানে স্বর্গে মা সরস্বতীর গায়ে পর্যন্ত গিয়ে গোলা লাগবে !

আমি বললুম, তুমি তো ডাক্তার—গানের কী জানো ? এর শেষটা যদি শোনো—তা আরো করুণ। বলে আবার টেবিল বাজিয়ে যেই শুরু করেছি—

'ধরা পড়ে গেল, বিচার হইল
ভুবনের হবে ফাঁসি,
হাউ হাউ করে লাড়ু-মুড়ি বেঁধে
ছুটে এল তার মাসী—'

অমনি বেরসিক মেজদা ধাঁই করে ডাক্তারী বইয়ের এক ঘা

আমার পিঠে বসিয়ে দিলে। বিচ্ছিরি রকম দাঁত খিঁচিয়ে বললে, আরে যা—খেলে কচুপোড়া। মাথা ধরিয়ে দিলি তো। লেখা নেই, পড়া নেই বসে ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাচ্ছে!

—বা-রে, এই তো সবে আমাদের স্কুলের সামার ভ্যাকেশন শুরু হল, এখুনি পড়ব?

—তবে বেরো, রাস্তায় গিয়ে চ্যাঁচা।

আমি গাঁ গাঁ করে বেরিয়ে এলুম রাস্তায়। এ-সব বেরসিকদের কাছে সঙ্গীত-চর্চা না করে আমি বরং চাটুজ্জেদের রকে বসে পটলডাঙার নেড়ী কুকুরগুলোকেই গান শোনাব।

কিন্তু গান আর গাইতে হল না। তার আগেই দেখি টেনিদা হন হন করে আসছে।

আসছে আমার দিকেই।

আমায় দেখেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললে, প্যালা, কুইক্ কুইক্। তোর কাছেই যাচ্ছিলুম—চটপট চলে আয়।

—আবার কী হল?

টেনিদা বললে, সিন্ধুঘোটক।

—অ্যাঁ!—কপাৎ করে আমি একটা খাবি খেলুম: সিন্ধুঘোটক? কোথায়?

—আমাদের বাড়িতে! বৈঠকখানায় বসে আছে।

—অ্যাঁ!

—তখুনি দু চোখ কপালে তুলে আমি প্রায় রাস্তার মধ্যেই ধপাস্ করে বসে পড়তে যাচ্ছিলুম, টেনিদা খপ্ করে আমাকে ধরে ফেলল। বললে, দাঁড়ানা, এখুনি ঘাবড়াচ্ছিস কেন? চলে আয় আমার সঙ্গে—

চলেই এলুম।

বুকের ভেতরটা হাঁকপাঁক করছিল। কিন্তু এই বেলা সাড়ে

ন-টার সময়—টেনিদাদের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে, সিন্ধুঘোট। আমাদের আর কী করবে ?

কিংবা, এ-সব মারাত্মক লোককে কিছুই বিশ্বাস নেই, রামহরি বটব্যাল কিংবা যদুনাথ আঢ্যের গোয়েন্দা উপন্যাসে দিনে দুপুরেই যে কত সব দুর্ধর্ষ ব্যাপার ঘটে যায় সে-ও তো আর আমার অজানা নেই।

আমি আর একবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, টেনিদা—সঙ্গে দস্যুদল—মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র—

—কিছুনা—কিছুনা, একেবারে একা।

—পুলিসে খবর দিয়েছো ?

—কিছু দরকার নেই। তুই আয় না—

'জয় মা তারা'—বলতে গিয়ে সেই অলক্ষুণে স্টুডিয়োটাকে মনে পড়ল, সামলে নিয়ে বললুম, জয় মা কালী—আর ঢুকে পড়লুম টেনিদাদের বাড়িতে।

আর ঢুকেই দেখি—চেয়ারে বসে সিন্ধুঘোটক।

সেই চেহারাই নেই। গায়ে মুগার পাঞ্জাবী, হাতে গোটাকয়েক আংটি, একমুখ হাসি। বললে, এসো প্যালারাম এসো—তোমার জন্যেই বসে আছি।

আমি হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলুম। তারপর ভয়টা কেটে গেলে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি—আপনি কে ?

—আমার নাম হরিকিঙ্কর ভড় চৌধুরী। 'মনোরমা ফিল্ম' কোম্পানির নাম শুনেছ তো ? আমিই সেই ফিল্ম কোম্পানীর মালিক।

—কিন্তু কাল রাতে—আমাদের নিয়ে আপনি এ সব কী কাণ্ড করলেন ?

—খুলে বললেই সবটা বুঝতে পারবে। এসে বোসো বলছি।

তারপর যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই ঃ

তিনি একটা ছবি আরম্ভ করবেন, বিজয়কুমারকে তার নায়ক করতে চান। কিন্তু বিজয়কুমার বলে বসেছেন গজানন মাইতির 'পথে পথে বিপদে—' ছবির কাজ শেষ না হলে তিনি কোনো ছবিতে নামবেন না। এখন গজানন মাইতির সঙ্গে হরিকিঙ্কর ভড় চৌধুরীর ঘোর শত্রুতা। হরিকিঙ্কর তাই পণ করলেন গজাননের ছবির শুটিং পণ্ড করে দেবেন।

কাল রাতেই ছিল গজাননের ছবির প্রথম শুটিং।

গজানন ঘুঘু লোক—সে হুকুম দিয়েছিল, তার শুটিংয়ে কোনো বাইরের লোক ঢুকতে পারবে না। সুতরাং এমন কাউকে দরকার —যে চট্ করে স্টুডিয়োতে ঢুকে যেতে পারে। আর সে পারে কম্বলরাম!

কিন্তু কম্বলরাম তো দেশে চলে গেছে। তাই তিন চারদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—ঠিক কম্বলরামের মতো একটা লোক কোথায় পাওয়া যায়!

তারপর গড়ের মাঠে আমাদের দেখা—

—কিন্তু বিজয়কুমারের নস্যির কৌটোর মানে কী? আর সিন্ধু-ঘোটক সাজবারই বা আপনার কী দরকার ছিল?

হরিকিঙ্কর মিটি মিটি হাসলেন।

—বিজয়কুমার ছেলেবেলায় খুব নস্যি নিতেন। একদিন স্কুলের ক্লাসে বসে নস্যি নিচ্ছেন, হেড্‌মাস্টারমশাই দেখতে পেয়ে কান ধরে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে বেত পিটিয়ে দিলেন। সেই থেকে নস্যির নাম শুনলেই বিজয়কুমার ক্ষেপে যান। এখন ফিল্মে ঢুকেও বিজয় কুমারের প্রতিজ্ঞা—তার ছবি তোলার সময় কেউ নস্যি টানলে, কিংবা

নস্যির নাম উচ্চারণ করলে তিনি তক্ষুণি স্টুডিয়ো থেকে চলে যাবেন। আর সিন্ধুঘোটক ?

—লোকে আড়ালে গজাননকে সিন্ধুঘোটক বলে। গজানন তা জানেন, তাঁর ধারণা কথাটা অপয়া, শুটিংয়ের সময় ওটা কানে গেলে একটা কিছু কেলেঙ্কারী হবেই।

টেনিদা বললে, এর জন্যে এত কাণ্ড করলেন আমাদের নিয়ে ? যদি গজাননবাবু আমাদের ধরে ঠেঙ্গিয়ে দিতেন, তা হলে ?

—তা হলে আমি তোমাদের হাসপাতালে পাঠাতুম। সে-সব ব্যবস্থাই ছিল।—

হরিকিঙ্কর আবার ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন। যাক—সব কিছুই ভালোয় ভালোয় হয়ে গেছে, আজ সকালে নিজে থেকে এসেই বিজয়কুমার আমার সঙ্গে ছবির কণ্ট্রাক্ট্ সই করে গেছেন।

—কিন্তু আপনি আমাদের ঠিকানা জানলেন কী করে ?

—কাল অবলাকান্ত তোমাদের রাস্তার মোড়ে পৌঁছে দিয়ে গেল না ? আর পটলডাঙার টেনি শর্মা তো বিখ্যাত লোক, তাকে খুঁজে বের করতে কতক্ষণই বা লাগে ?

আমরা চুপ।

হরিকিঙ্কর বললেন, এইবার কাজের কথা, তোমাদের কিছু পুরস্কার দেব বলেছিলুম। অনেক করেছ, রং চং মাখিয়ে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছি—আমার একটা কৃতজ্ঞতা তো আছে। এই প্যাকেট তোমাদের দুজনকে দিয়ে গেলুম, আমি যাওয়ার পরে খুলে দেখো।

কাগজে মোড়া দুটো ভারী বাক্স তিনি তুলে নিলেন আমাদের দুজনের হাতে। টেনিদা গাঁইগুঁই করে বললে, আমাদের একদিন ছবির শুটিং দেখাবেন স্যার ?

—আলবাৎ—আলবাৎ। যেদিন ভালো শুটিং হবে, সেদিন আগে

থেকে খবর দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে তোমাদের নিয়ে যাব। চাই কি জনতার দৃশ্যে নামিয়েও দিতে পারি—

একটু হেসে বললেন, সেখানে গিয়ে যেন নস্যির কৌটো-ফৌটো বলো না যেন আবার।

—পাগল! আর বলে!—আমরা দুজনে একসঙ্গে সাড়া দিয়ে উঠলুম!

—তা হলে আমি আসি—টা-টা—

হরিকিঙ্কর চলে গেলেন। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম, গলির মোড়ে একটা মস্ত লাল মোটর দাঁড়িয়েছিল, সেইটেতে চড়ে তিনি দেখতে দেখতে উধাও হলেন।

তখন হাতের প্যাকেট দুটো খুললুম আমরা।

কী দেখলুম?

টেনিদার হাতের প্যাকেটে একটা ট্রানজিস্টার রেডিও আর আমার প্যাকেটে একটা ক্যামেরা।

দুটোই নতুন—ঝকঝক করছে।

আর আকাশ ফাটিয়ে টেনিদা হাঁক ছাড়ল: ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—

আমি বললুম, ইয়াক্—ইয়াক্!

শেষ